TARAPITHER SADHAK

By

BHABESH DUTTA

Price—Rupees Eight only

তারাপীঠের সাধক

ভবেশ দত্ত



ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

॥ প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৮১

॥ প্রকাশক ॥

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাশ

৩৭।১, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

॥ প্রচ্ছদপট ॥

শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী

॥ মুদ্রণে ॥

শ্রীবাবুলাল প্রামাণিক

সোমা প্রকাশন

২এ, কেদার দত্ত লেন

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

অকালে ঝরে-যাওয়া হৃদয়-মাণিক

শ্রীমান মিহির কুমার দত্তর (বাবলু) পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

—বাবা

॥ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

সাধক তুলসী দাস

প্রভু নিত্যানন্দ

সাধক হরিদাস

সাধক কমলাকান্ত

পরমহংস নিগমানন্দ

ভারতের সাধিকা

আমাদের কথা

তারাপীঠের সাধক পরমসিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষেপার পূর্ণ জীবন-আলেখ্য ও তাঁর অলৌকিক ঘটনাবলী পরিবেশন করি এমন শক্তি আমার নেই। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বড় ছেলেটাকে হারিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে যাই। কি করি, কোথায় যাই, এ তাপ-দগ্ধ মনে কোথায় গেলে একটু শান্তি পাবো—এই আশায় বারবার কয়েকবার তারাপীঠে মা তারার চরণে ছুটে যাই। কি পেয়েছি তা আমি জানিনা। কি যে পাইনি তাও আমি জানিনা। সেখানে ঘুরে ঘুরে বহু জ্ঞানী-গুণীর কাছ থেকে পরমপুরুষ বামাক্ষেপা সম্বন্ধে যা শুনেছি, যা সংগ্রহ কোরতে পেরেছি তাই শুধু নিবেদন কোরলাম। মা তারার অপার করুণা না হোলে এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হোত না। বামাক্ষেপার অলৌকিক ঘটনাবলী যা ব্যক্ত কোরেছি তার সত্যাসত্য বিচার কোরবার মত জ্ঞান আমার নেই। মা তারা আছেন। বামাক্ষেপা ছিলেন। তাঁর সাধনার কথা, তাঁর দিব্যজীবনের কথা সারাদেশের মানুষ আগ্রহ ভরে শুনছেন এইটাই পরম সত্য।

ভারতবর্ষ সাধকের দেশ। যুগে যুগে সাধক এসেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পথে মানুষের মনের পতিত জমিতে প্রেমধর্মের বীজ ছড়িয়েছেন। আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তাইতো বাজছে অহরহ সেই অমৃতময় বাণী—

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যাতি হরে দেবী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

এই বই রচনায় অনেকের কাছেই কিছু কিছু ঋণী আছি। তাদের নামাবলী এ বইয়ের সংগে জড়িয়ে না দিতে পারলে আমাকে অপরাধী হোতে হবে। তাঁরা হোচ্ছেন বন্ধুবর সাহিত্যিক শ্রীযুগল

কিশোর মাইতি, নৈহাটির শ্রীসরোজ দত্ত, চাকদহের শ্রীকানাইলাল চক্রবর্তী, রাণাঘাটের শ্রীসত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ক্যালকাটা একাডেমীর শ্রীজহরলাল বক্সী। হালিসহর জেঠিয়া নিবাসী অণুজ-প্রতিম শ্রীরেণুপদ ঘোষ এ বইয়ের ভেরতরকার ছবি তুলেছেন। তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ভোলানাথ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশ মহাশয়কে, যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া এ বই প্রকাশ হোত কিনা সন্দেহ। সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী শ্রীমৃণাল চক্রবর্তীকে—যিনি বইটির প্রচ্ছদ এঁকে বইটিকে সর্বাংগসুন্দর কোরেছেন।

যদি দেশের অগণিত গুণী-জ্ঞানী পাঠক সমাজের একজনেরও বইটি পড়ে ভাল লাগে তাহলে বুঝবো আমার পরিশ্রম সার্থক হোয়েছে। সেই হবে আমার মা তারার আশীর্বাদপুতঃ পরম পুরস্কার।

রাণাঘাট
নদীয়া
৩০. ৫. ৬৫

ভবেশ দত্ত

—দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা—

মায়ের অশেষ কৃপাবলে "তারাপীঠের সাধক" দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হোয়ে আত্মপ্রকাশ কোরল। অনেকদিন আগেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হোয়ে গিয়েছিল, নানান অসুবিধা ও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্বিত হোল, তার জন্য আমি নিজে যথেষ্ট মনোবেদনা ভোগ কোরেছি। মনোবেদনার কারণ এই জন্য যে, এই দীর্ঘদিনের মধ্যে দেশের অগণিত পাঠক বার বার পত্র দিয়েও বই পাননি। বহু ভক্তপাঠক প্রকাশকের কাছে বইয়ের জন্য এসেছেন, কিন্তু তাঁরা বই না পেয়ে ফিরে গেছেন।

মা তারার কৃপায় প্রকাশক শ্রীসুরেশ দাশ অনেক বাধা-বিপত্তির সিঁড়ি ভেঙে বইটি যে পুনর্মুদ্রিত কোরেছেন এজন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে কোরেছি।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর সারাদেশের ভক্ত সুধীজন, সংবাদপত্র, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র আমাকে যে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের এ স্নেহপ্রীতির ঋণ শোধ কোরবার সাধ্য আমার নেই।

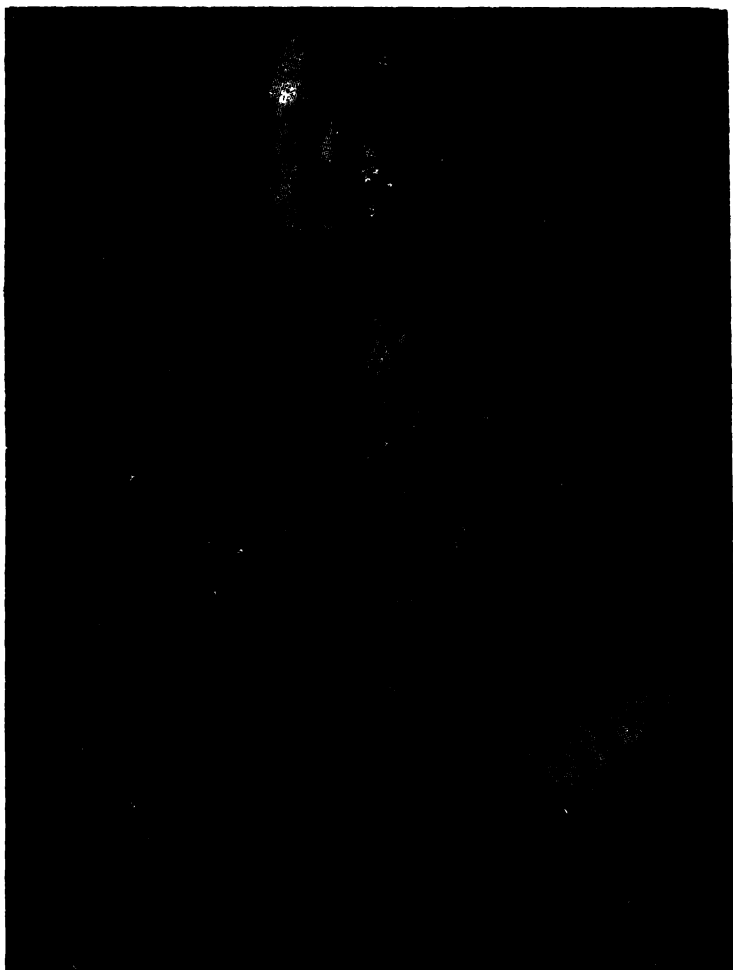
সকলের আশীর্ব্বাদই হোক আমার বাকী জীবন পথের পাথেয়। সবাইকে আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছি।

শুভ দোলউৎসব —ভবেশ দত্ত—

রাণাঘাট

নদীয়া

১৩ই চৈত্র, ১৩৮১



তারাপীঠের সাধক—শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা



জীবিত কুণ্ডের ওপারে দেখা যাচ্ছে তারামায়ের মন্দির।
(ফটো :—সুরেশ দাস)

॥ এক ॥

পায়ের পাতা ডোবেনা—

কিন্তু সারা দেহ মন ডুবে যায় অতল তলে। বার বার মন চায় পায়ের পাতা-না-ডোবা স্রোতের ধারার নীচে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যাই অতল তলে—দেখে আসি কি অমূল্য রত্নখনি আছে সেখানে ; মন বলে—নাই বা ডুবলো পায়ের পাতা, দেহ-মন-প্রাণ এক কোরে ডুব দাও, পেয়ে যাবে অমূল্য ধন। জলে নৌকা ভাসার মত ভেসে বেড়ালে; কি আর মিলতে পারে? ধন ঐশ্বর্য, বন্ধু-বান্ধব, সংসার সমাজ, স্নেহ প্রেম ভালবাসা হয়তো এই ধরণের আর কিছু মিলতে পারে। আরও আছে অনেক কিছু, যা পেলে হৃদয় ভরে। মনে হয় সব পেলাম। তা পেতে হোলে ভেসে বেড়ালে চলবে না। জল খেতে খেতে ডুবে যেতে হবে অতল তলে।

সুতালী নদীর রূপালী জলে একি স্রোত?

মনে হচ্ছে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনে কে আছে দেখতে দেবে না। কে কোথায় কাঁদছে তাও শুনতে দেবে না। কে কার প্রতীক্ষায় আছে তাও ভুলিয়ে দেবে।

আশ্চর্য নদী!

অত্যাশ্চর্য তার জলধারা!

কারও থেমে দাঁড়াবার উপায় নেই। পেছনে কে ডাকছে তাও জানতে দেবেনা।

চল শুধু সামনে আর সামনে—

এ পৃথিবীতে এসে যা পেলে তাতে তোমার সঞ্চয়ের থলি পূর্ণ হয়নি—এখনও অনেক খালি আছে। এখনও অনেক বাকী আছে; তাইতো সামনে চলার এত তাড়া।

তাই চলো, ওগো সুতালী নদী তুমি আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলো উদ্দাম গতিতে। তারপর এমন যায়গায় ডুবিয়ে দিও যেখানে গেলে কিছু যেন পাই। যাতে আমি ভাবতে পারি এ দুনিয়ায় এসে পেয়েছি এবার পরম ধন যা দিয়ে সারা দুনিয়া আমি কিনতে পারি।

কিন্তু!

এ পৃথিবী বড় সুন্দর জায়গা। এর প্রতি অনুপরমাণুতে কি এক অপূর্ব মায়া। এখানে পাখীর গানে মন পাগল করে। চাঁদের আলোয় জীবনের অংগন প্রাংগন জ্যোছনায় ডুবে যায়। পূবালী বাতাসে মনের বাতায়ন আপন মনেই খুলে যায়। পুত্রস্নেহ, পত্নী-প্রেম, আপন জনের মধুমাখা কণ্ঠস্বর হৃদয়ের সমস্ত অলিগলিতে অপূর্ব সুরসৃষ্টি করে। এখানে আছে অর্থ, আছে অনর্থ। নেই শুধু পরমার্থ। তাতে কি এসে যায়।

তবু আমার এ পৃথিবী বড় মোহময়ী। বড় সুন্দর! এর ধুলো-রাঙা পথে যতদূর যাই শুধু হাসি আর গান।

এ ঐশ্বর্য ছেড়ে কোথায় আমি যাবো!

চলতে চলতে থামতে হয়।

পায়ে জোর দিয়ে স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকি।

পেছনে পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছে সরোজদা: ওহে! পেছনে যে আমরা আছি।

সত্যিই বুঝি মনে ছিল না—

সব ভুলে গিয়েছিলাম। স্রোতের মাঝে চলতে চলতে কি তবে এতক্ষণ ভাবছিলাম!

এ পৃথিবীতে কবে যেন এসেছি একাই। যেতেও হবে একা

কিন্তু মাঝখানে যাদের পেলাম তারা যে আমার আপন জন। পা যেন টলছে—

বহুদূরে তাকিয়ে দেখি জলপ্রপাতের মত জলস্রোত ছুটে আসছে। আর বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। কয়েকবার টলতে টলতে সামলে নিলাম।

মাঝ নদীতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে শুধু বললাম: আসুন সরোজদা ; আপনাদের ফেলে একা পার হবো কেমন কোরে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো ওরা কয়জন।

সহকর্মী সরোজ দত্ত, কানাই চক্রবর্তী, অনুজ প্রতিম সত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পিছনে আমার স্ত্রী, তার কোলে আমার দেড় বছরের ছেলে বাপী, আর এক হাতে আমার কন্যা আনু। সবাই এলাম এপারে—

মাটিতে মাথা ঠেকালাম।

জীবন ধন্য হোল কিনা জানি না।

মনে হয় একটু বাঁচলাম!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জলস্রোত। কেমন সুন্দর তর-তর কোরে বয়ে যাচ্ছে।

এই সেই দ্বারকা নদী!

কিছুদূরে ভয়াল ভয়ংকর অমানিশার চেয়ে অন্ধকারময় ঘন জংগল। এপার ওপার কিছুই দেখা যায় না—শুধু দুর্ভেদ্য জংগল। দিনের বেলায় মনে হয় রাতের মত অন্ধকার।

জংগলের ভিতর আগুন জ্বলছে।

আগুনের লেলিহান শিখায় গাছের কাঁচা পাতা যেন ঝলসে যাচ্ছে।

চিতা জ্বলছে।

জীবনের হিসাব-নিকাশের বাঁধানো মহাজনী খাতা পুড়ে চলেছে।

মহাশ্মশান।

এই দ্বারকা নদীর ধারে মহাশ্মশানে বসে বাংলার এক দামাল ছেলে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি তান্ত্রিক সাধকের মধ্যে শেষ সিদ্ধ পুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা।

ঝির্ ঝির্ কোরে বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টির ধারা গায় লাগছে না, শুধু মনে হোচ্ছে শির শিরে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যেন গায় আছড়ে পড়েছে।

ওপারে পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে একটা স্ত্রীলোক চীৎকার কোরে কাঁদছে। পেছনে আর কয়েকজন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

শুনলাম সেইদিনই তার চার বছরের একটা ছেলে মারা গেছে। তার কান্নার সুরে যেন এপার ওপার একাকার হোয়ে যাচ্ছে।

এপারে জ্বলছে ছেলের চিতা।

ওপারে ছেলের মা কাঁদছে।

কিছুদূরে তারা-মায়ের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

মা কি মন্দিরের ভিতর বসে বসে হাসছেন।

হয়তো তাই হবে—

পরের সম্পত্তি ভোগ দখল কোরে এখন তাকে হারিয়ে আবার কান্না। কার জন্য এ আকুল ক্রন্দন। ওকে তুমি পেলে কোথায়। জঠরে ধরেছিলে অধরে রেখেছিলে. এখন তার সময় হোয়েছে চলে গেলো।

ব্যস্ তোমার চৌকিদারী শেষ।

এবার নিয়োগকর্তার দিকে দৃষ্টি দাও—

চোখের জল শুকিয়ে যাবে। যদি তা না পারো তাহলে কাঁদো।

মাকি সত্যিই হাসছেন।

পাড় ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হবে।

ওপরে উঠে দেখি স্ত্রীর চোখে অবিরাম জলের ধারা বয়ে চলেছে। স্ত্রী আমার কাঁদছে।

তারও আঠারো বছরের এক ছেলে মারা গেছে কিছুদিন আগে।

পথ চলতে চলতেই বোললাম : দেখলে তো, এ তুনিয়ায় তুমি শুধু একা নয়—আরও আছে অনেক যাদের বুকে তোমারই মত আগুন জ্বলছে! চোখের জল সব শেষ কোর না। তুফোঁটা চোখের জল মা তারার জন্য ফেলো, অনেক শান্তি পাবে।

স্ত্রীর ঠোঁঠ তুটি শুধু একটু নড়ে উঠলো।

সত্য শুধু বোললে : বৌদি! সারা রাস্তা তো দেখলাম চোখের জল ফেলতে ফেলতেই এলেন, এবার একটু শান্ত হন—পথ এখনও অনেক বাকী। এখনই ভেঙে পড়লে এতটা পথ শেষ কোরবেন কি কোরে?

তারাপীঠে এলাম।

কবে থেকে ভাবছিলাম যেতে হবে তারাপীঠ। জন্মে অবধি যাদের মাথার বোঝা ঘাড়ে নিতে হোয়েছে তাদের মাথার বোঝা কিছু হালকা কোরে এ পথে আসা খুবই শক্ত।

তাই ভাবছি—শুধু ভাবছি।

আমি আসিনি—মা তারাই এনেছেন!

মা আমার দয়াময়ী, তাই তো তিনি দয়া করেছেন। তা না হোলে অতদূর থেকে এলাম কি কোরে!

কোথায় রানাঘাট আর কোথায় রামপুরহাট।

ধন্য বীরভূম, ধন্য বীরভূমের মানুষ। এরই মাটিতে বায়ান্ন পীঠের তিনটি পীঠস্থান—নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী, তুবরাজপুরের কিছুদূরে দেবী অট্টহাস, সাঁইথিয়ায় দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশর। তারাপীঠ থেকে চার মাইল দূরে বীরচন্দ্রপুরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান। কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবি জয়দেব, নান্নুরে চণ্ডীদাস, তারাপুরের পাশে আটলা গ্রামে সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা। আরও কত ছড়িয়ে আছে এই মাটিতে......!

বীর প্রসবিনী বীরভূমি। বীরভূম তুমি ধন্য। ভারত আত্মার মর্ম-কথাই যেন ধ্বনিত হোয়েছে তোমার গেরুয়া মাটিতে।

বহুজনের সংগে আমাদেরও জীবন আজ সার্থক হোয়েছে। রামপুরহাট থেকে পীচের রাস্তা চলে গেছে মাইল চারেক তারাপীঠের দিকে, সেখান থেকে উঁচু-নীচু কাঁচা মাটির পথে আরও মাইল দেড়েক পায়ে হেঁটে তারাপীঠ!

উঁচুনীচু পথ—

গতকালই বুঝি বৃষ্টি হোয়ে গেছে। আঠার মত পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে কাদা। চলতে চলতে পা পিছলে যায়। লাল মাটিতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে, মনে হোচ্ছে কে যেন একটু আগে দুধ ছিটিয়ে গেছে। পথের দুপাশে কন্টিকারী গাছ, তার মাথায় ফুলের টোপর। কিছুদূরে বনঝোপের অন্তরালে তারাপীঠের মা-তারার মন্দিরের চূড়া দেখা যায়!

পথ কষ্ট যেন আর থাকে না—

শুধু মনে হয় এইতো এসে গেলাম। একটু পরেই মায়ের চরণ-প্রান্তে পৌঁছবো।

আর ভাবনা নেই।

না, ভাবনা আর কিছুই নেই। যা পেছনে ফেলে এসেছি তার কথা আর ভাববো না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি মায়ের মন্দিরের দিকে।

সত্য বোললে আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য কোরে: বৌদি, বাপীকে আমার কোলেই দিন—দেড়মাইল পথ বেশ এসেছে আমার কোলে, এটুকুই আর বাকী থাকে কেন।

—অনেক কষ্ট কোরেছো তুমি—তুমি না এলে কি যে কোরতাম।

সত্য হাসতে হাসতে বোললে: আমি না এলেও ঠিক আসতেন। যিনি আনবার তিনিই নিয়ে আসতেন।

সরোজদা বার বার মায়ের মন্দিরের দিকে চাইছেন আর প্রণাম কোরছেন। কানাইদা মনে মনে কি যেন মন্ত্র আওড়াচ্ছেন।

তিনি দুবেলা জপ আহ্নিক না কোরে জল গ্রহণ করেন না। হয়তো মনে মনে মায়ের মন্ত্র ধ্যান কোরছেন।

আমি একেবারে আলাদা—

মন্ত্রও জানি না, জপতপও জানি না। কোন ধর্মপুস্তক বা জ্ঞানমার্গের কোন অমূল্য হিতোপদেশ সংবলিত কোন বইও আমার ঘরে নেই।

মহাপাপী আমি।

যিনি আমাকে দুনিয়ায় পাঠালেন তাঁকে আমি চিনলামও না, জানলামও না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সংসার সংসার খেলা কোরেই কেটে গেলো। শেষের দিনের কোন কাজই আমার করা হোলো না। দেহ-মন পতিত জমির মতই পড়ে রইল, আবাদ করা আর হোল না।

মন্ত্রপাঠ জপতপ না কোরলেও বুঝতে পারি সবার ওপরে কেউ যেন একজন আছেন। যিনি সারা বিশ্বময় জুড়ে সব কিছুর ওপর নজর রাখছেন।

তাইতো আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠছে, গাছে ফুল ফুটছে।

তুমিও চলছো, আমিও চলছি—সবাই চলছি।

চালক একজন আছেনই অদৃশ্য হোয়ে। তিনিই তো চালাচ্ছেন।

মন্দিরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

শুধু ইসারায় মানা কোরলাম চোখের জল ফেলতে।

দুচোখে কাপড় চেপে বোললে: এতদূর এলাম কিন্তু কই আমি যাকে খুঁজছি সে কই! বল, আমি কোথায় গেলে তাকে পাবো।

জবাব দেওয়ার ভাষা যেন আমারও হারিয়ে গেছে।

চোখ দুটি কেন জানি ঝাপসা হোয়ে আসে।

শুধু বোললাম : মন্দিরে যিনি আছেন তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করো। যদি ডাকার মত ডাক দিতে পারো তো জবাব তোমার মিলবে।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি শান্ত হবে না?

—আমার হারানো জিনিস এনে দাও।

—তুমি কি পাগল হোলে৷ তোমার জিনিস মায়ের কাছে আছে। ফিরিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে কাঁদো। চল সিঁড়ি বেয়ে।

আশপাশে ভিখারীর ভীড়—

পয়সা দাও!

আর কিছু নয়, পয়সা!

পেটের কথা ভেবেই কলিকালের মানুষ সব হারালো। শুধু খেতে দাও, পরতে দাও, সুখ দাও, শান্তি দাও—রাজা করো, প্রভুত্ব কোরবার শক্তি দাও! আমরা জ্ঞানও চাই না, ভক্তিও চাই না, মুক্তিও চাই না। শুধু ক্ষুধা—দেহের, মনের, যৌবনের। মুক্তির ক্ষুধা নেই আমাদের : জীবনের সন্ধ্যাবেলায় পারের ঘাটে যখন দাঁড়াবো তখনও বুঝি আমাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না।

'জয় তারা' 'জয় তারা'।

চমকে উঠি।

একটা অর্ধ উলংগ মানুষ চীৎকার কোরে উঠলো।

সামনে তার কাপড় পাতা। তাতে দেখলাম চাল আর পয়সা ছিটানো। দীন ভিখারী সেও ডাকতে জানে—

মন্দিরের নীচে একপাশে একটা বিরাট পুকুর।

শান বাঁধান সিঁড়ি—

এই সেই জীবিত কুণ্ড।

এ কুণ্ডের মাহাত্ম্য অত্যাশ্চর্য।

রত্নগড়ের বণিক জয়দত্ত ব্যবসাসূত্রে আসতেন তারাপুরে। এক-কালে এখানে ভাল সিল্কের কাপড় তৈরী হোত্। সেই কাপড়

কিনতে জয়দত্ত আসতেন বড় বড় নৌকা সাজিয়ে। এই দ্বারকা নদীর পারে এসে তাঁর নৌকা নোঙর কোরত।

রত্নগড়ের জয়দত্ত ঠিক যায়গায় এসেই নোঙর কোরেছিলেন। সারা জীবন ধরে তিনি কত ঘাটেই নোঙর কোরেছেন। নৌকা ভর্তি কোরে কত সম্পদ সঞ্চয় কোরেছেন। জীবনের লাভ লোকসানের হিসাব নেওয়ার সময় তাঁর ছিল না। ধন ঐশ্বর্যের আবরণে তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন। ধন ঐশ্বর্যই তাঁর উপাস্য দেবতা। ধ্যান ধারণাও তাঁর ঐশ্বর্যকেই ঘিরে। কিন্তু আসলে মহাজনকে তিনি হিসাব দিতে পারেন নি—তাই জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় তাঁর নৌকা এসে নোঙর কোরল আসল মহাজনের ঘাটে।

পালাবে কোথায়, পালানোর রাস্তাই বা কই!

তাইতো ধরা দিতে হোল!

জয়দত্ত।

রত্নগড় যার আঙুলের সংকেতে চলে। সারা রত্নগড় যার ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত তারই একমাত্র আদরের ধন, জীবনের আশাভরসা একমাত্র পুত্রের দ্বারকা নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার মধ্যে হঠাৎ ভেদবমি হয়! শত চেষ্টাকে অবহেলা কোরে তার পুত্র নৌকার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। উদভ্রান্ত জয়দত্ত সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা কোরতে লাগলেন অদৃশ্য দেবতার কাছে।

কেউ সাড়া দিল না।

শেষে দ্বারকা নদীর পাশে মহাশ্মশানে তার চিতা সাজানোর ব্যবস্থা হোল।

রত্নগড়ের বণিক জয়দত্তর চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। কোন কথা নেই, যেন বোবা হোয়ে গেছে!

এমন সময় একজন মাঝি এসে বোললে: হুজুর! অবাক কাণ্ড ঘটেছে।

জয়দত্ত শুধু চোখ মেলে তাকালেন মাঝির দিকে—

—হ্যাঁ হুজুর, সত্যিই ঘটেছে—কাটা মাছ ধুতে গিয়েছিলাম ঐ পুকুরে, মাছগুলো সব জোড়া লেগে পালিয়ে গেলো।

—ব্যাটা গাঁজাখোর।

জয়দত্ত বিদ্রূপ কোরে বোললেন।

মাঝি বোললেঃ হুজুর! মিথ্যে আমি বলিনি, গাঁজাও আমি খাইনি।

জয়দত্ত উঠে দাঁড়ালেন—

এ অসম্ভব সম্ভব হোল কিসে!

তবে কি কোন অলৌকিক রহস্য আছে এর পেছনে!

জয়দত্ত সোজা হোয়ে দাঁড়ালেন : তবে চল্ তোর ঐ পুকুরে, দেখি আমার ঐ মরা ছেলে ঐ পুকুরে স্নান করালে বেঁচে ওঠে কিনা। যদি বেঁচে ওঠে তবে বুঝবো তোর কথা ঠিক—নইলে তোকেই আজ ঐ পুকুরে ডুবিয়ে মারবো।

মাঝি শুধু বোললেঃ বেশ তাই হোক।

মরা ছেলে কাঁধে কোরে নিয়ে চলেছে দুজন মাঝি। পিছনে জয়দত্ত।

মাঝি নিয়ে গিয়ে ঐ মরাছেলে পুকুরে ফেললো।

মরা ছেলে 'জয় তারা' বোলে লাফিয়ে উঠলো।

জয়দত্ত অবাক বিস্ময়ে চীৎকার কোরে ওঠেঃ জয় তারা।

দুচোখে তার জলের ধারা।

মাঝি জয়দত্তর সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলঃ হুজুর!

—ওরে, নৌকার নোঙর মাটিতে জোরে বসিয়ে দে, যেন ওঠে না। ঠিক যায়গায় এসে আমার নৌকা ভিড়েছে রে। 'জয় তারা' বোলে তিনি নৃত্য কোরতে লাগলেন।

দ্বারকা নদীর তীরে মহাশ্মশানের এক প্রান্তে জংগলের মধ্যে

এখনও একটা পরিখা দেখা যায়। এই পথেই নাকি জয়দত্তের নৌকা এসেছিল!

কালের জপমালা ঘুরে ঘুরে চলে গেছে কালান্তরে।

সে দ্বারকা নদীতে আজ ডিঙি নৌকাও চলে না।

জীর্ণ শীর্ণ নদী আজ যেন বয়সের ভারে সরু হোয়ে গেছে।

সে জয়দত্ত আজ নেই। সে রত্নগড় আজ ইতিহাসের পাতায় কোথায় আছে তাও জানিনা।

শুধু অবাক হোয়ে ভাবছি।

জীবিত কুণ্ডের সিঁড়িতে বসে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম দূরের ঐ খণ্ড খণ্ড মেঘাচ্ছন্ন আকাশ! মেঘগুলো উড়তে উড়তে এসে ঐ মন্দিরের চূড়ার ওপরে যেন স্তব্ধ হোয়ে থাকছে! কি চায় ওরা! ওরাও কি তারা মায়ের কৃপাপ্রার্থী?

জীবিত কুণ্ডের মাঝে ছোট ছোট পদ্মপাতার আড়ালে একটা পানকৌড়ি শুধু ডুবছে আর উঠছে! দেহের যত পাপ সব বুঝি ধুয়ে মুছে ফেলছে।

পানকৌড়ি সেও ডুবতে জানে উঠতে জানে।

আমরা ডুবতে জানলাম না। শুধু ভেসে ভেসেই জীবন-যৌবন চলে গেলো। কি বিচিত্র পরিবেশ এই দেবস্থানের।

কোন কোলাহল নেই। পথঘাটে লোক চলছে। মনে হয় কারও কথা বুঝি শোনা যাচ্ছে না—গাছপালা জংগলাকীর্ণ হোয়ে আছে, কিন্তু কোন পাতার খসখসানি শোনা যায় না। পাখীও বুঝি ডাকে না—কাকও এখানে উচ্চস্বরে কা কা করে না। দ্বারকার প্রচণ্ড স্রোতের এতটুকু শব্দ নেই। সবাই নিস্তব্ধ নীরব।

সবার বুঝি একই চিন্তা! কোলাহল হোলে কি বুঝি হারিয়ে যাবে। সে স্বর্ণ-মুহূর্ত কেউ বুঝি হারাতে চায় না।

সবাই যেন কান পেতে আছে—ঐ বুঝি ডাক আসে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বোলেছেন—ভগবানকে ডাকার সময় পাও না—বেশ, তবে চুপ কোরে কান পেতে শোন; তিনিই তোমাকে ডাকছেন।

এখানকার সবাই যেন তাই কান পেতে আছে।

তারা মায়ের ডাক শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব।

আমিও নিস্তব্ধ সবার সাথে।

ঝির ঝির কোরে বৃষ্টি হোচ্ছে।

টের পাইনি এতক্ষণ—জোরে যখন বৃষ্টির ফোঁটা এসে দেহের কুঠরীতে ঘা মারলো তখন খেয়াল হোল ভিজে যাচ্ছি! মাগো, তুমিও আমায় ঘা মারো! আমার জীবনবীণার তারে আঘাত করো। আমি বেজে উঠি, আমি জেগে উঠি। আমাকে জাগাও মা! আমি যে কালঘুমে মৃতপ্রায়।

॥ দুই ॥

তারাসিদ্ধ হোলেন ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠদেব।

দেবীর মন্দিরের কাছে পঞ্চবটি !

চারিদিকে অজস্র বনঝোপ। আশসাওড়া আর বুনোগাছের ভীড়। শ্মশানের এখানে ওখানে কংকাল আর হাড়গোড় ছিটানো। সদ্য পুঁতে রাখা মরা মানুষের দেহ নিয়ে শৃগাল কুকুর আর শকুনের টানাটানি। কোথাও পড়ে আছে মড়ার মাথার খুলি, কাকের দল তাতে অনবরত ঠোকরাচ্ছে। মাঝে মাঝে শিমূল বন।

সবচেয়ে যে বড় শিমূল গাছ ছিল তারই তলায় পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই আসনে বসেই বশিষ্ঠদেব প্রথম সিদ্ধিলাভ করেন।

তারাপীঠের ঐতিহাসিক তথ্য কিছু না পাওয়া গেলেও পৌরাণিক তত্ত্ব কিছু কিছু পাওয়া যায়।

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক।

তথ্য আর তত্ত্ব।

ইতিহাস আর কাহিনী।

এসব যদি নাই পাওয়া যেত তাতে আর কি আসে যায়।

তারাপীঠ আছে, মা তারা আছেন।

আর কি চাই। বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়েই তো মা আমার ঐশ্বর্য্যময়ী সেজে বসে আছেন।

মাগো! তোমাকে জানতে হোলে আমার ইতিহাসও দরকার নেই, কোন কাহিনী বা তথ্যেরও প্রয়োজন নেই।

যা হোলে তোমাকে জানবো তাই তুমি আমাকে দাও।

কি সে জিনিষ ?

তা হোচ্ছে ভক্তি, সেই ভক্তি তুমি আমাকে দাও।

যার জোরে তোমার চরণে পৌঁছাতে পারি।

* * * *

প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টি কোরলেন।

ব্রহ্মা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন—

কি সুন্দর পৃথিবী। ঐ যে নীলাকাশ, ঐ যে চাঁদের আলো। ঐ যে ফুলের বনে মৌমাছির কলধ্বনি। মিঠাসুরে সঙ্গীতের লহর তুলে ঐ যে স্রোতস্বিনীর ঢেউ বয়ে চলেছে এর তুলনা কোথায়?

কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবী, এখানে এত সুখ, এত আনন্দ, এ ভোগ কোরবে কে? এত সুখানন্দের আস্বাদই বা কে গ্রহণ কোরবে। চিন্তিত হোলেন ব্রহ্মা।

চারিদিক ঘুরলেন—সেই একই আনন্দ।

ভোগ কোরবার কেউ নেই।

এসব ভোগ কোরতে হোলে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের প্রয়োজন। তিনি দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিবৃন্দ, নারাদাদি, শনকাদি মহর্ষিগণের সৃষ্টি কোরলেন।

এরাই হোলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র।

বশিষ্ঠদেব এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এঁরা জন্মেই ভগবানের তপস্যায় নিজেদের নিয়োজিত কোরলেন। ঈশ্বর ধ্যান, ঈশ্বর মনন. ঈশ্বর স্মরণ এই হোল এঁদের নিত্যকর্ম পদ্ধতি। এমন সুন্দর পৃথিবী, এত ঐশ্বর্য্য, কোন কিছুর দিকেই এঁরা তাকালেন না।

যে দিকে তাকান সেইদিকেই ঈশ্বর।

সারা দেহমন দিয়ে তাঁরা সেই পরমবস্তুর সাধনায় ডুবে গেলেন। ভক্তিধনের সন্ধানে তাঁরা ডুবছেন আর উঠছেন। পরমানন্দময়, পরম বস্তুলাভই হোল তাঁদের ধ্যান ধারণা। পৃথিবী যেমন তেমনই রইল, তার কোন পরিবর্ত্তন হোল না। এঁরা জন্ম নিলেন বটে কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হবে কি কোরে? ব্রহ্মা চিন্তিত ও বিষণ্ণ।

তিনি পুত্রদের বোললেন বিয়ে কোরে সৃষ্টির সহায়তা কোরতে হবে। এ তাঁর আদেশ।

কিন্তু এ আদেশ তাঁদের কাছে মৃত্যুদণ্ডের সামিল হোল। এর চেয়ে মৃত্যুকে বরণ কোরতে তাঁরা প্রস্তুত।

পৃথিবীতে এমন ঈশ্বর ভুলে থাকার মত পাপ আর নেই, তাঁরা মানলেন না ব্রহ্মার আদেশ।

পৃথিবীতে যত দুঃখ কষ্ট তার একমাত্র কারণই বিবাহ।

কামিনী আর কাঞ্চন।

কাঞ্চন আর কামিনী।

এই দুইয়ের দণ্ডীর মধ্যে যে পা দেবে তার আর নিস্তার নেই। ইহকাল পরকাল তার সবই গেলো।

ধ্যান জ্ঞান সবই তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সংসারে সমাজে জীবের দুঃখ কষ্টের সূত্রপাত এই বিবাহ থেকেই। কামিনী আসে বাঘিনীর মত। কাঞ্চন আসে অকিঞ্চনের বেশে। তারা সব ভুলিয়ে দেয়। মায়ামোহের চাদরে জড়িয়ে ফেলে জীবকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়।

পুত্রা বিদ্রোহ কোরলেন।

না, যে জিনিষ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় সেই জিনিষ তাঁরা গ্রহণ কোরবেন না।

সকলে ব্রহ্মার কাছে অনুনয় কোরলেন এ কঠিন আদেশ তুলে নিতে।

কিন্তু ব্রহ্মা অবিচল।

যদিও তিনি বুঝলেন পুত্রদের যুক্তি যথার্থ।

কিন্তু সৃষ্টি তো চাই।

তিনি ক্রোধান্বিত হোলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ হোল।

অভিশাপ দিলেন পুত্রদের।

প্রজাপতি দক্ষকে বোঝালেন, তুমি তো আমার কথা শুনলে না

আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, একদিন তুমি জামাতার হাতে নিদারুণ অপমানিত হবে এবং ছাগ মুণ্ড ধারণ কোরবে।

নারদ ও বশিষ্ঠকে বোললেন, আমাকে যেমন অবহেলা কোরলে তেমন আমার অভিশাপে তোমাদের চিরকাল দুঃখ কষ্টে কাটাতে হবে। মহাজ্ঞান তাপস নারদ আর বশিষ্ঠ বুঝলেন যে, এ অভিশাপ ব্যর্থ হবার নয়! যাক, যখন যা হবার তাই হবে, এখন সময় নষ্ট কোরে লাভ কি? দুজনে আবার সাধনায় ডুব দিলেন!

তারপর কেটে গেলো অনেক বছর।

বশিষ্ঠদেব তপস্যা ছেড়ে এবার তীর্থ পথিক হোলেন।

অনেক পথ, বন বনান্তর, নদী সমুদ্র পার হয়ে তিনি চীনদেশের মাটিতে এসে পা দিলেন।

তখন সেখানে সবাই তারা-দেবীর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু একি পূজা! ফুল নেই, বিল্বপত্র নেই, নেই কোন ধূপ-দীপ, নেই কোন মঙ্গল ঘট। তার বদলে আছে মদ আর মাংস। বশিষ্ঠকে আসতে দেখে তাঁরা সে সব আগেই সরিয়ে ফেললেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠ তা বুঝতে পারলেন।

ঘৃনায়, ক্ষোভে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত কোরলেন!

এ যে তামসিক পূজা!

এ পূজায় কি দেবতা সন্তুষ্ট হন।

বশিষ্টদেব বোললেন: না, না, এসব পূজার উপকরণ হোতে পারে না। পূজার উপকরণ ভক্তি, শ্রদ্ধা, অপেক্ষা, প্রতিক্ষা ও তিতিক্ষা। পূজার উপকরণ একাগ্রতা ও একমনা হওয়া।

চীন দেশী সাধকরা বিরক্ত হোলেন বশিষ্টের উপর।

তাঁরা তাঁকে তিরস্কার কোরলেন,—ছিঃ। তুমি বুঝি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, এই বুঝি তোমার পুরুষত্ব, এই বুঝি তোমার সাধনা। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বিবাহের ভয়ে যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার মুখে এসব কথা শোভা পায় না।

চারিদিকে খাদ্য সম্ভার দেখে যে লোভ সংবরণ কোরতে পারে সেই তো সাধক। আমাদের পূজায় তোমার মন ভরলোনা, কিন্তু তুমি এই ভাবে পূজা না কোরলে হাজার জন্মেও সিদ্ধ হোতে পারবে না।

ব্যথিত হোলেন বশিষ্ঠদেব।

বেদনার ঝুলি স্কন্ধে কোরে তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থে এসে অনশনে দেহ ত্যাগ করলেন।

এক জন্মের অবসান হোল বশিষ্ঠদেবের।

তাঁর ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসু মন স্তব্ধ হোয়ে গেলো।

ঈশ্বরের ধারে কাছেও তিনি যেতে পারলেন না।

কেন এমন হোল ?

সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান না কোরতে পারলে এ পথে চলা যায় না। বশিষ্টদেব জ্ঞানী হোয়েও ভুল কোরলেন।

সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ এ সবের সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর।

যা ভাল তাও তাঁর।

যা মন্দ তাও তাঁর।

এ দুটো এক করাও তাঁরই কাজ।

মানুষের শত চেষ্টাতেও এ দুটো জিনিষ এক হয় না।

এক মাত্র তাঁর ইচ্ছাতেই সম্ভব।

*　　*　　*　　*

দ্বারকানদীর ধারে কুবুদ্ধ নামে এক জ্ঞান তাপসের আশ্রম ছিল। বন-বনানী ঘেরা এই আশ্রমটি তপোবনের মতই মনে হোত। সংসার বীতরাগ এই সাধক চিরকুমার।

কোন বাসনাই তাঁর ছিল না।

শুধু ছিল একটি বাসনা তা হোল ঈশ্বর দর্শন। এই বাসনাতেই তিনি যোগাসনে বসে ছিলেন দ্বারকার তীরে। মানুষের আশা ও যাওয়ার বিরাম ছিল না এই আশ্রমে। মানুষের দুঃখ কষ্টের তিনি ভাগীদার ছিলেন। ঈশ্বরের কাছে তিনি সকলের জন্যই প্রার্থনা কোরতেন।

এ পারে মুনিবর কুবুদ্ধের আশ্রম।

ও পারে চন্দ্রচূড় রাজার রাজধানী।

এ পারে ত্যাগ ও তিতিক্ষার ক্ষেত্র আর ওপারে ভোগের ও কামনার বিচরণ ভূমি।

কুবুদ্ধের আশ্রম থেকে কিছু দূরে অনাদিলিঙ্গের মন্দির। রানী তারাবতী মাঝে মাঝে অনাদিলিঙ্গের পূজো দিতে আসতেন। যখনই তিনি আসতেন পূজান্তে মুনিবর কুবুদ্ধের চরণ বন্দনা কোরে যেতেন।

এক দিন দ্বারকা নদীতে স্নানান্তে রাণী তারাবতী দাসীর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন।

মুনিবর কুবুদ্ধ আশ্রম থেকে রাণী তারাবতীকে এক দৃষ্টে দেখতে লাগলেন। তারাবতীর রূপে তিনি এত মুগ্ধ হোলেন যে তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটলো।

ধ্যানে তারাবতীর ছবি ভেসে উঠলো তাঁর মানস পটে। কোথায় ঈশ্বর?

তারাবতীময় হোল তাঁর মন প্রান।

কামিনী বাঘিনী হোয়ে সাধকের জীবন-বেদীতে আশ্রয় নিল। তারপর এক দিন রাণী তাঁর চরণ বন্দনা কোরতে এলে কুবুদ্ধ তাঁর মনের অভিপ্রায় জানালেন এবং তাঁর বাসনা পূর্ণ না কোরলে অভিশাপ দেবেন বোলে ভয় দেখালেন।

উভয় শঙ্কটে পড়লেন রাণী তারাবতী।

তিনি পতিব্রতা রমণী—স্বামীই তাঁর আরাধ্য দেবতা।

তাঁর পক্ষে এ কাজ কি কোরে সম্ভব—

ধর্ম নষ্ট, সতীধর্ম কলুষিত হবে তাঁর।

রাণী তারাবতী বেতসপত্রের মত কাঁপতে লাগলেন। দুচোখে তাঁর জলের ধারা।

কুবুদ্ধ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

রাণী তারাবতী মুখ নীচু কোরে বোললেন,—তাই হবে, আমি সন্ধ্যার পরে একা এসে আজই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ কোরব।

দাসী হারাবতী সব জেনে মর্মাহত।

সে চিন্তা কোরল—

না, এ হোতে পারেনা—এ হোতেও দেব না! যে ভাবে হোক রাণীর সতীত্ব রক্ষা কোরতেই হবে। দীর্ঘদিন সে রাণীর অন্নে প্রতিপালিতা, রাণীর ঋণ শোধ কোরবার এই তার সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে। এতে তার যে পাপে ডুবতে হয় ডুবতে রাজী আছে, তবুও রাণীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতেই হ'বে। সে দাসী হোতে পারে কিন্তু রূপ তো তারও আছে, এ রূপে কি মুগ্ধ হবে না মুনিবর।

হারাবতী অকপটে রাণীকে জানালেন সব কথা।

রাণী তারাবতী প্রথমে রাজী হোলেন না। দাসী হোলে তারও ধর্ম আছে, সে ধর্ম নষ্ট কোরবার সম্মতি তাকে তিনি কি কোরে দেবেন।

কিন্তু হারাবতী শুনলে না সে কথা—

তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

আকাশের এক কোণে চাঁদ উঠেছে।

সপ্তমী বা অষ্টমীর চাঁদ।

রাণী তারাবতী দাসী হারাবতীকে নিজ হাতে সুন্দর কোরে সাজিয়ে দিলেন। কপালে দিলেন কুমকুমের টিপ। দীঘল বেনীতে গুঁজে দিলেন সুগন্ধী পুষ্প, গলায় দিলেন বেলফুলের মালা। সারা অঙ্গে ছিটিয়ে দিলেন অগুরু চন্দন।

হারাবতী ঐ বেশে কুবুদ্ধির আশ্রমে উপস্থিত হোল।

কামে জর্জ্জর কুবুদ্ধ চিনতে পারলেন না তাকে।

হারাবতীর রূপের আগুনে কুবুদ্ধ ঝাঁপ দিলেন।

দাসী হারাবতীও নিজেকে নিঃস্বভাবে সমর্পন কোরলেন কুবুদ্ধের কাছে।

মুনিবর হারাবতীকে কাছে রেখে দিলেন কিছুদিন।

হারাবতী গর্ভবতী হোল।

কুবুদ্ধ বুঝলেন কি ভুল তিনি কোরলেন। এ জীবনে তাঁর এ ভুলের সংশোধন হোল না। ধীরে ধীরে তাঁর দেহ ক্ষীণ হোল। চক্ষু অন্ধ হোল।

তারপর একদিন দেহত্যাগ কোরলেন।

নিত্যবস্তু ফেলে অনিত্যবস্তু নিয়ে ঘর কোরলে যে ফল হয় তাই হোল।

যথাসময়ে হারাবতীর এক পুত্র সন্তান হোল।

এই পুত্রই বশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত হোলেন কালে কালে। ছোটবেলা থেকেই বশিষ্ঠের জ্ঞানের বিকাশ হোতে থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান ধীরে ধীরে সবই তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে। যৌবনের সুরুতেই তিনি জননীর অনুমতি নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হন।

কিন্তু তপস্যায় বসেই তিনি বহু বাধার সম্মুখীন হন।

নানারকম বিভীষিকা তিনি দেখতে থাকেন।

তারানামের বৈঠা নিয়ে তিনি সাধনার তরী বেয়ে নিয়ে চলেন। হঠাৎ তিনি দৈববাণী শুনতে পান—বশিষ্ঠ, তুমি আমার সাধনার ধারা সম্বন্ধে কিছুই জানো না, তাই ইতিপূর্বেও একবার ব্যর্থ হোয়েছো, আবার এবারও সেই পথ ধরেছো। মহাচীনে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন তোমাকে নির্দ্দেশ দেবার জন্য অপেক্ষারত—তুমি দেরী না কোরে তাঁর কাছে যাও।

আবার সেই মহাচীনের পথ ধরলেন বশিষ্ঠ।

বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন তাঁকে নির্দ্দেশ দিলেন—বীরভূমের দ্বারকা নদীর ধারে এক শ্বেতসিমুল গাছ আছে, সেখানেই তোমার আরাধিতা তারা আছেন। তিনি শিলাময়ী, দেবী দ্বিভূজা সর্পময় যজ্ঞোপবীতভূষিতা। বাম ক্রোড়ে পুত্ররূপে মহাদেব শায়িত, এইরূপ চিন্তাই হোল তোমার সাধনা। এতেই হবে তোমার সিদ্ধিলাভ।

ফিরে এলেন বশিষ্ঠ দ্বারকানদীর ধারে।

যোগাসনে বসলেন বশিষ্ঠ।

দীর্ঘকাল তারা-মায়ের সাধনা কোরে কোজাগরী পূর্ণিমার পূর্বদিন

শুক্লাচতুর্দ্দশীর রাতে তিনি আরাধিতা তারামার দর্শন পান ও সিদ্ধিলাভ করেন।

বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনের বর্ণিত মূর্ত্তিই আজ তারাপীঠে পূজিতা। যে আসনে বসে বশিষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করেন তা আজও তারাপীঠে বশিষ্ঠ-সিদ্ধপীঠ নামে বিদ্যমান।

বশিষ্ঠ ছাড়া তাঁরই নামে সিদ্ধিলাভ করেন পরশুরাম, দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা।

এই বশিষ্ঠই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের কুল-পুরোহিত ছিলেন। বশিষ্ঠদেব দুইজন্মে মাতৃদর্শন লাভ কোরলেন।

সাধনায় একাগ্রতা থাকলে মা যে দর্শন দেন তার প্রমাণ বশিষ্ঠ।

ত্রিতাপদগ্ধ কলি জীবেরও এ ছাড়া গতি নেই।

মা মা কোরে কাঁদতে হবে—

বাঁধা তিনি পড়তেনই একদিন না একদিন।

দেবদেবতা, সাধক ভরা ভারতবর্ষে হাজার হাজার প্রমাণ আছে এ কথার।

ডাকলে তিনি আসবেনই—

কাঁদলে তিনিও কাঁদবেনই—

তিনি যে মা।

সন্তান কাঁদলে মা আর কতদূরে থাকবেন।

কোলে তাঁকে নিতে হবেই।

যেমন মা তারা বশিষ্ঠদেবকে কোলে নিয়েছিলেন।

মা তারা সন্তুষ্ট হোয়ে বলেন: আমি সন্তুষ্ট হোয়েছি তোমার সাধনায়, বর প্রার্থনা করো।

বশিষ্ঠদেব আসনে বসেই বোললেন, আমি তোমাকে মাতৃরূপে দেখতে চাই—স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তোমার স্তন পান কোরছেন —এই মূর্তিতে আমি দেখতে চাই। এ ছাড়া আমার অন্য কোন প্রার্থনা নেই।

চমকে ওঠেন মা তারা! সেকি! তিনি যে আমার স্বামী, সে রূপ তোমাকে আমি কি কোরে দেখাবো, তুমি অন্য বর চাও।

—না! যা চেয়েছি তাই যদি না পাই তা হোলে আমি কিছুই চাই না।

মা তারা বোললেন, তাই হবে!

তিনি অদৃশ্য হোয়ে যান।

বশিষ্ঠদেব দেখতে পান সামনে একটা শিলামূর্তি।

জগৎজননী মা তারা মাতৃরূপে স্বয়ং মহাদেবকে কোলে কোরে স্তন পান করাচ্ছেন।

তিনি সযত্নে মূর্তিটি নিজে প্রতিষ্ঠা করেন তারাপীঠে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই বিরাট নাট মন্দির, তার একপাশে তারাদেবীর মন্দিরে মা তারার শিলামূর্তি।

শিলামূর্তির অধিকাংশই রূপালী আবরণে ঢাকা। সমস্ত মূর্তিটাই একটা সুসজ্জিতা কৃত্রিম নারীমূর্তি!

গলায় বহুমূল্য হার। মাথায় চূড়া। চরণ দুটি যেন রক্তকমল। মন্দিরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কৃত্রিম খোলসে ঢাকা মূর্তিতে অমন হাসি এলো কোথা থেকে।

দেবীর স্নানের সময় সমস্ত আবরণ খুলে ফেলা হয়, তখন প্রকাশ হয় আসল শিলামূর্তি।

কি অপরূপ সে মূর্তি!

ক্ষুধার্ত সন্তান মায়ের কোলে শুয়ে পরম তৃপ্তি ভরে দুধ খাচ্ছেন। মায়ের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে কি অপরূপ মাতৃত্বের ছাপ।

শিমূল গাছ আজ নেই—কিন্তু আসন আছে। প্রকৃত যোগী পুরুষ ছাড়া এ আসনে বসে কার সাধ্য। এ আসনে বসতে হোলে যে সাধনার প্রয়োজন হয় তা যদি কারও জানা না থাকে তাহলে তার জীবন বিপন্ন হোতে পারে।

বশিষ্ঠদেবের পর এই আসনে বসেছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রের মহান

সাধক আনন্দনাথ। সর্বগুণসম্পন্ন মহাপণ্ডিত মোক্ষদানন্দ। শেষে বামাচরণ।

তিনিও এই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেন।

ছ'শত বছর আগে এবার পিছিয়ে যেতে হবে।

তারাপীঠে তখন আসেন বিরাট শক্তিধর সাধক বিশেক্ষেপা। তারপর একে একে আসেন আনন্দনাথ, আসেন মোক্ষদানন্দ। আসেন সাধকশ্রেষ্ঠ কৈলাসপতি বাবা।

মহাপুরুষ কৈলাসপতি বাবাই বামাক্ষেপার সারাজীবনকে সাধনার জ্যোতিতে আলোকিত করেন! কৈলাসপতি বাবা তাঁর সাধন জীবনের সমস্ত রসটুকু নিংড়ে বামাক্ষেপার কণ্ঠে ঢেলে দেন। বামাক্ষেপা সেই অমৃত রস পান কোরে হোলেন তারাসিদ্ধ।

কৈলাসপতি ছিলেন সর্ববুদ্ধিপূর্ণ সিদ্ধপুরুষ।

বামাক্ষেপা ছায়ার মত আছেন তাঁর সাথে। যেমন কোরে মায়ের পেছন পেছন ছেলে ঘুরে বেড়ায়। কোন জ্ঞান নেই। বোধ নেই, আপন মনে কৈলাসপতি বাবার কাছে কাছে কলুর বলদের মতই ঘোরেন। ত্বচোখে যেন ঠুলি বাঁধা।

পৃথিবীতে থেকেও যেন পৃথিবীতে নেই।

কতবড় পৃথিবী। কত কি জানবার, দেখবার, কোন কিছুই তাঁর খেয়াল নেই। কখন কি করেন তাও যেন তাঁর খেয়াল নেই। কখনও হাসছেন। কখনও কাঁদছেন।

যেন বালক।

একদিন কৈলাসপতি বাবা ধ্যান থেকে উঠেই একটা মরা তুলসী গাছের ঝাড় দেখিয়ে বোললেন: ক্ষেপা, বলতো দেখি এটা জ্যান্ত না মরা?

ক্ষেপা হাসতে হাসতে জবাব দেয়: এটা তো মরা!

কৈলাসপতি বাবা বোললেন: জীবন আর মৃত্যু কিন্তু একই বাবা! মানুষের জীবনেরও ছুটি দ্বার। একটা জীবন আর একটা

মৃত্যু। এ দুনিয়ায় কেউ মরে না, সবাই অমর বুঝলি। তুলসী জিউ। তুলসী জিউ।

কৈলাসপতি তাঁর কমুণ্ডল থেকে জল ছিটোলেন।

মরাগাছ বেঁচে উঠলো।

বামাক্ষেপা আনন্দে নৃত্য কোরতে থাকে।

কৈলাসপতি বোলে ওঠেন : বুঝবিরে একদিন।

ক্ষেপা নিজেও বুঝেছিল, পরে অপরকে বুঝিয়েছিল।

তারাপীঠে মায়ের মন্দিরে একটি মণিবিন্দু আছে। সতীদেবীর তিনটি চোখের মণিবিন্দু তিনটি স্থানে পড়ে। তারাপীঠে শ্বেত শিমূল বৃক্ষমূলে পড়ে ঊর্ধ্বনয়ন তারা। সেই মণিবিন্দু তারাপীঠে এখনও বিদ্যমান।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান এই মণিবিন্দু।

যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা এই তারাকে সতীদেবীর ঊর্ধ্বনয়ন-তারা হিসেবে অন্তরে উপলব্ধি করেন।

সব কিছুই মন নিয়ে—

এই মন যদি দেখে সব কিছু সত্য শাশ্বত বলে, তবে তাই প্রকৃত সত্য। সত্যাসত্য যাচাই কোরবার মত কষ্টিপাথর ক'টা মানুষের আছে আজকের দুনিয়ায়। মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে বোলেই তো দুঃখ শেষ হোচ্ছে না। সংসারে বসে শোক-তাপ-দুঃখ-কষ্টের যম-যাতনা ভোগ কোরছে।

ভক্ত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে থামের মধ্যে দেখিয়েছিলো তার প্রাণের ঠাকুরকে। সে বিশ্বাস তার ছিল।

আবার ফিরে যাওয়া যাক দ্বারকা নদীর ধারে জীবিত কুণ্ডের ধারে ; যেখানে আমার সংগীরা বসে আছে।

আমার বাপীকে দেখলাম সত্যর কোলে পরমানন্দে খেলা কোরছে। মেয়ে আন্নু মায়ের স্নান করা দেখছে।

স্ত্রীকে দেখলাম শুধু ডুবছে আর উঠছে।

ঠিক সেই পানকৌড়িটার মত।

নীচু সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে বোললাম: প্রাণভরে দেহটাকে ভিজিয়ে নাও এই জীবিত কুণ্ডে। এখানে স্নান কোরলে মৃতবৎসা পুত্রলাভ করে।

স্ত্রী জলে দাঁড়িয়েই বোললে: আর হারানো ছেলে ফিরিয়ে পাওয়া যায় না?

—সে পেয়েছিলো একজন রত্নগড়ের বণিক জয়দত্ত, সেকথা তো আগেই জেনেছো! এখানে একদিন অসম্ভবও সম্ভব হোয়েছিল—বিশ্বাস থাকলে হয়তো আজও হয়।

—আমিও তো বিশ্বাস কোরেই ছুটে এসেছি তবে—

—ছুটে এসেছো বটে, কিন্তু আগের জনমে কতটা রাস্তা এগিয়েছিলে তা কি তোমার জানা আছে? জানা নেই—এ জনমে কাঁটার আঁচড় তোমার গায়ে হয়তো লাগেনি, কিন্তু আগের জনমে কাকে তুমি কাঁটার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত কোরেছো তা কি তোমার মনে আছে? সকলের ভুল হোলেও একজনের ভুল হয়নি! তার খাতায় সব লেখা আছে—যা কোনদিনই মুছে যাবে না।

স্ত্রী জলভরা চোখেই আমার দিকে তাকালো।

বোললাম: হ্যাঁ, তিনি ঐ মন্দিরে আছেন, তাঁর কাছেই যে হিসাবের খাতা!·········

"তারাপীঠং মহাপীঠং সম্ভব্যং যত্নতঃ সদা
বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী"

—তারারহস্যম্

স্ত্রীকে বোললাম: যাও মন্দিরে! সুযোগ যখন এসেছে তখন তা হেলায় হারিও না। ছেলে ছেলে কোরে কাঁদছো, এবার কাঁদো মা মা বলে। দেখো 'ত শিলাময়ী মা তোমার ডাকে সাড়া দেন কিনা। যাও—দেরী কোর না, পুজো আরম্ভ হোচ্ছে।

ঝাপী পিছু পিছু চলেছে টুকটুক কোরে—
মায়ার জীবন্ত একটা মালগাড়ী—
জননী বেঁধে নিয়ে টেনে চলেছে।
শ্রী জীবিতকুণ্ডে স্নান কোরে সোজা মন্দিরে উঠে গেলেন,

"পশ্চিমে চ শ্মশানংস্যাৎ দ্বারকোত্তর বাহিনী
তত্রৈব স্নান দানেনং গঙ্গা স্নানং পুণ্যং লভেৎ"

পাপ ও পুণ্যের বিচার যিনি কোরবার তিনি কোরবেন।
মা তারা ওর প্রাণে তুমি একটু শান্তি দাও।

॥ তিন ॥

১২৬৪ সালে সিদ্ধকৌল ব্রজবাসী কৈলাসপতি এসেছিলেন। বামাচরণকে তিনি পথ দেখাতেই আবির্ভূত হোয়েছিলেন তারাপীঠে। তিনি শুধু মরা তুলসী গাছকেই জীবন্ত করেননি— তিনি শূন্যমার্গে বিচরণ কোরতে পারতেন, জল থৈ থৈ নদীতে সোজা হেঁটে চলে যেতেন। সূক্ষ্মদেহ ধারণ কোরে এক মুহূর্তে হাজার হাজার যোজন পথ চলে যেতে পারতেন। বামাচরণের প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন তিনি।

বশিষ্ঠদেবের আসনে কালে কালে অনেক সাধকই সিদ্ধিলাভ করেন। নিগমানন্দ, তারাক্ষেপা, থাকিয়াবাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, সাধক কমলাকান্ত।

তাঁরা এই আসনে বসেই তারাময় জগৎ দেখেছিলেন। ক্ষুধায় তারা, তৃষ্ণায় তারা, শয়নে তারা, স্বপনে তারা, জাগরণে তারা, সব কিছুতেই তারা। মনপ্রাণ তারাময় না হোলে কি মাকে পাওয়া যায়! তাই 'তারা' 'তারা' কোরেই যেন তাঁদের নিঃশ্বাস বইত। বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দেও যেন তারানাম।

সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে নিগমানন্দ ছুটে চলেছেন তীর্থের পর তীর্থে। মন্দিরে মন্দিরে মাথা খুঁড়ছেন, কিন্তু পরম বস্তুর সন্ধান পাচ্ছেন না। সাধুসন্ত দেখলেই মাথা নীচু কোরে প্রণাম করেন। শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনছেন দিনের পর দিন। পাগলের মত ছুটছেন তিনি পাহাড়-পর্বতে, নিবিড় বনানীর অভ্যন্তরে; কিন্তু কই মেলে কই! জীবন বুঝি শেষ হোয়ে যায়! ধরেও তিনি ধরতে পারছেন

না। কখনও বনের মাঝে হরিণের পিছু ছুটছেন। কখনও জলভরা মেঘের সাথেই ঘুরছেন।

কিন্তু মেলে কই !

পরম পাওয়াকে বুঝি তাঁর পাওয়া হোল না।

তারপর তিনি সাক্ষাৎ পেলেন এক মহাযোগী পূর্ণানন্দের।

আঁকড়ে ধরলেন তাঁকে।

আর ছাড়লেন না।

পূর্ণানন্দ বোললেন : ওরে তুই কি চাস ?

নিগমানন্দ কথা বলেন না, শুধু শ্রাবণের বারিধারা বয়ে যায় তাঁর চোখে। বোবা হোয়ে গেলেন নিগমানন্দ।

পূর্ণানন্দ আবার বোললেন : বুঝতে পেরেছি স্ত্রীর জন্য পাগল হোয়েছিস—পাগল আর কাকে বলে। তোর মাঝে যে এক বিরাট সাধক লুকিয়ে আছে, তাকে জাগা। তোর কাছে যে এ দুনিয়ার শোকতাপদগ্ধ মানুষ অনেক কিছু আশা কোরে বসে আছে। তুই তাদের নিরাশ করিসনে।

চমকে ওঠেন নিগমানন্দ।

কথা তিনি বোলতে তবুও পারছেন না।

চোখের জলে সব কথা ডুবে যাচ্ছে।

—বাবা, মৃতাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তুমি মাকে ডাকো। তাহলেই তোমার সব পাওয়া হবে। মৃতার জন্য শোক করা তোমার সাজে না।

পূর্ণানন্দ কখনও তুই, কখনও তুমি, কখনও বাবা বোলে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

নিগমানন্দ জলভরা চোখেই বোললেন : কিন্তু আমি যে শূন্য।

—কে বোললে তুমি শূন্য ? তুমি পূর্ণ। শুধু তাই নয়, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম। তুমিই তো সেই। নিজেকে নিজে এবার চিনতে পারবে। সময় হোয়ে এসেছে।

নিগমানন্দ এলেন ফিরে।

সেই রাতেই মা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন ও বলেন: তারাপীঠে বামাক্ষেপার কাছে যাও। তিনি তোমার সব বাসনা পূর্ণ কোরবেন। পথ চেয়ে যে বসে আছেন তিনি—লগ্ন উপস্থিত, যাও।

তারাপীঠে শ্বেত শিমূল মূলেই একদিন নিগমানন্দের মাতৃদর্শন হয়। এক অপূর্ব জ্যোতিতে তাঁর সারা জীবন যেন ঝলসে যায়। সেই জ্যোৎস্নার প্লাবনের মাঝেই নিগমানন্দ শুনতে পান মায়ের ডাক—বৎস! এই বিশ্ব আমাতেই অবস্থিত, আমিই সব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবই যে আমি। আমিই চন্দ্র-সূর্য, আমিই পশু-পক্ষী, কীট-পতংগ। আমিই মহীরূহ, লতাগুল্ম। আমি আকাশ বাতাস। আমি পাপপুণ্য, আমি সত্যাসত্য। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, সাধু অসাধু, অজ্ঞান বিজ্ঞান, আমিই তো তুমি। এই ভূমণ্ডলে, অনলে সলিলে পাতালে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

ভক্ত পেলো ভগবানকে।

ভগবানও পেলেন ভক্তকে।

নিগমানন্দ তখন মায়ের চরণতলে।

"নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাগং নিরাপরং নিরূপনম্
নিত্যবোধম্ চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্।"

॥ চার ॥

তখন পরাধীন ভারতবর্ষের এক কলংকময় অধ্যায় চলছে। বিধর্মীর অত্যাচার চললো নিষ্ঠুরভাবে, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীহরণ, শিশুহত্যা।

অন্যায় আর অবিচারের দাপটে ভারতবর্ষের হৃদ্‌পিণ্ড থর থর কোরে কাঁপছে। পালানোর কোন পথ নেই—ভারতবর্ষের নরম মৃত্তিকায় গড়ে উঠছে পাপের প্রাসাদ। দয়া নেই, মায়া নেই; কোন সহানুভূতি নেই, অত্যাচারের ইতিহাসে শুধু রক্তের আলপনা।

কালচক্রের বিবর্তন হোল। এলো ম্লেচ্ছ যবন—তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোল। সোনার ভারত যেন কলংকের মসীতে ভরে গেল। অসি ধরবে কে? অত্যাচারীর খড়্গের সামনে বুক পেতে দিল ভারতের মানুষ—প্রতিরোধ কোরবার শক্তি নেই।

হিন্দুধর্ম বুঝি রসাতলে যায়। হিন্দুর হিন্দুত্ব, নারীর মান সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হোল। মহাশক্তির লাল শাড়ীর ঘোমটা খসে পড়লো মাটিতে। লাল সিঁথিতে দেখা গেলো কলংকের কালি। লাখো লাখো দ্রৌপদীর ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হোয়ে গেলো!

ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন থর থর কোরে কাঁপছে। চমকে উঠছে ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং, আর মেগাস্থিনিসের আত্মা—এ কোন্ ভারতবর্ষ! যে ভারতবর্ষের ছবি তাঁরা দেখে গিয়েছিলেন সে ভারতবর্ষ কি পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে গেলো?

তারপর এলো খ্রীস্টান মিশনারী—নানারকম লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে এ দেশের মানুষকে তারা ধর্মান্তরিত কোরল। দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, জাতীয় সংহতি, ধর্ম সব বুঝি চলে যায়।

বাংলার অতি প্রাচীন জেলা বীরভূমের লাল মাটি তখন প্রসব

বেদনায় কাতর! আবির্ভাব হোলেন এই ঘোর দুর্দিনে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, কবি জয়দেব, পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস। এঁরা সর্বহারা মানুষের কানে বাঁচার নতুন মন্ত্র দিলেন; সাহিত্য কাব্যের মাধ্যমে, কীর্তন পালাগান, যাত্রা কথকতার ভিতর দিয়ে জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ কোরলেন। অজ্ঞ মূর্খ দরিদ্র দেশবাসীর জীবনে যেন নতুন সূর্যোদয় হোল। মানুষের মত বাঁচার অধিকার সকলেরই আছে। হৃদয়ের বন্ধ দরজা যেন এক দমকা হাওয়ায় খুলে গেলো।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রচার কোরলেন তাঁর অহিংসার বাণী: "মারো কাটো ক্ষতি নেই, প্রেম বিলাতে দাও।" চণ্ডীদাস বোললেন: "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"! জয়দেব গাইলেন:

স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

দেখতে দেখতে চারিদিকে বীরাচারী শাক্ত সাধকের আবির্ভাব হোল। ভারতের নানান প্রান্ত থেকে ডাক শোনা গেলো তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের। মিথিলা, উত্তর প্রদেশ, বিদিশা, মধ্যপ্রদেশ, মদ্র, বাংলা দেশ তাঁদের পদ-ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো।

এঁদের আত্মপ্রকাশ মানুষকে এক সূত্রে গেঁথে ফেললো। ছড়ানো ফুল এক সুতোতে বাঁধা পড়লো। কুসংস্কারের ধূম্রজালে যে জাতি আচ্ছন্ন ছিল সে জাতির চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে কুয়াসা কেটে গেলো! তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—প্রচার কোরতে লাগলেন জাতিভেদ দূর কোরে ফেলো, অস্পৃশ্য কেউ নেই। আমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান। ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলে এক চন্দ্রাতপের তলায় এসে দাঁড়াও। তোমাদের ভিতর যে অনন্ত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তাকে জাগ্রত করো। মহাশক্তির সাধনায় ডুবে যাও। কেউ অংগ

স্পর্শ কোরতে পারবে না। ভয় নেই। সামনে আছেন বরাভয়দায়ীনি আদ্যাশক্তি মা, তিনিই পথ দেখাবেন—চল এগিয়ে চল।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[—গীতা—৪র্থ—৭-৮]

ধর্মের গ্লানি যখনই হয় তখনই হয় ঈশ্বরের আবির্ভাব। জাতির এই চরম দুর্দিনের সন্ধিক্ষণে একই সময়ে আবির্ভূত হোলেন পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তারাপীঠের তান্ত্রিক ভৈরব জাগ্রত মহাদেব বামাচরণ।

একদিকে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার তীরে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মনিবেশ কোরলেন পরম সাধনায়। ধর্মপরায়ণ একটা গোটা জাতির বিলুপ্তি হোতে দেবেন না; পৃথিবীর নীল দরিয়ায় সনাতন ধর্মের বিসর্জন হোতে পারে না।

আর একদিকে তান্ত্রিক সাধক বামাচরণ দ্বারকা নদীর তীরে তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসে তারা মায়ের তপস্যায় বসলেন শ্বেত শিমূল তলায়। সিদ্ধ হোলেন তারাপীঠে বামাচরণ। তারাসিদ্ধ হোলেন বামাক্ষেপা। তাঁর কণ্ঠে যেন দুন্দুভি বেজে উঠলো—যপাৎ সিদ্ধি।

জপ কোরলেই সিদ্ধি হয়। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সংসার, ধর্ম-বিদ্বেষ ভুলে একমনে মা তারার নাম জপ কোরতে পারলেই সাধন-পথে সিদ্ধি মেলে। মায়া জয় কোরতে পারলে মহামায়ার দেখা পাওয়া যায়।

তিনি বোললেন: নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই গীতা, নাম হোতে বড় কিছুই নেই!

আবার পরক্ষণেই বোললেন: মায়া ত্যাগ কোন্ শালা কোরতে পারে। মায়াই যে মা। যার মায়া নেই সে তো নরাধম। জয় কর মায়া। তোদের জড়শক্তি বেড়েই চলেছে। চৈতন্য শক্তির বিকাশ চাই। চৈতন্য শক্তির বিকাশ না হোলে মানুষ হওয়া যায় না। মায়াকে জাগালে মাও জাগবেন, তবেই তো তাঁর কোলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে হবে। আছাড়ি পিছাড়ি খেতে হবে। কেঁদে বুক ভাসাতে হবে। মা-মা কোরে না কাঁদলে মা কি কোলে তুলে নেয়! ওরে ক্ষিধে পেলেই শুধু মাকে ডাকবি, মা মা কোরে কাঁদবি—কেনরে দিনরাত মা মা কোরে কাঁদ্ না, তাহলে দেখবি মা আর কোল থেকে নামাবে না। একবার যদি মায়ের কোল পাস তবে রুই মাছের ঝোলও বিস্বাদ লাগবে। ডাক্, ডাক্ একবার! ডেকেই দেখ্ না।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

[—গীতা ৯ম-২২]

যারা আমাকে ভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা করে না, আমাকে সর্বতোভাবে আরাধনা করে তাদের আমি সব সময় রক্ষা করি।

জাতির চৈতন্য-শক্তি জাগানোর দায়িত্ব নিলেন বামাচরণ মহাশ্মশানে বসে! আকাশে-বাতাসে, ইথারে-ইথারে, নদীর জলস্রোতে, পাখীর কলতানে, পথের ধুলোতে তিনি ছড়িয়ে দিলেন গোটা জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর মন্ত্র—যেখানে ভক্তি সেখানেই মুক্তি, ভক্তি নেই ভগবানও নেই। কর্ম হতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে ভক্তি, ভক্তি হতে প্রেম। এই প্রেমের কাঙালই হতে হবে। কাঁদ্ ওরে, প্রাণ ভরে কাঁদ্। মা তারা ঠিক কোলে নেবে।

মহাশ্মশানে জেগে রইলেন কলির মহাদেব বামাক্ষেপা। মানুষ

কালঘুমে আর কত ঘুমাবে—এ ঘুম তো জাগরণের ঘুম নয়। এ যে মরণের ঘুম! অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের যূপকাষ্ঠে যে জাতির বলিদান হতে বসেছিল সে জাতিকে ঘা মেরে জাগানোর মন্ত্র তিনি হুংকার কোরে ছাড়লেন—'জয় তারা'। ওরে রাত পোহাল, সূর্যের আলো যে তোর মুখমণ্ডলে ছেয়ে গেলো, চেয়ে দেখ্ চোখ মেলে! মা যে তোকে শিয়রে বসে ডাকছেন ঃ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

[গীতা—১৮।৬৬]

॥ পাঁচ ॥

বাংলা সন ১২৪৪। শিবচতুর্দশীর দিন। মহানিশা। বাংলা ও বাঙালীর জীবনে এক পরম লগ্ন। ঐ দিন তারাপুরের কাছে আটলা গ্রামে পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। শিবচতুর্দশীর মহানিশার ঘোর অন্ধকারে যেন আটলা গ্রামে চাঁদ উঠলো। শাঁখের আওয়াজে সর্বানন্দর বাড়ি যেন চমকে উঠলো—আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো আটলা গ্রামের বনঝোপে। কুঁড়ি যত ছিল সব যেন একসাথে ফুটে উঠলো।

ভগবান এসেছেন আটলার মাটিতে।

সর্বানন্দর তুই ছেলে, বামাচরণ আর রামচন্দ্র।

চারটি মেয়ে—জয়কালী, তুর্গা, দ্রবময়ী ও সুন্দরী।

ছটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দরিদ্রের সংসার। সংসারের কানাগলি দিয়ে দিনরাত অভাব-অনটনের আনাগোনা! জীর্ণ সংসার-তরণী। এতগুলো যাত্রী নিয়ে কর্ণধার সর্বানন্দ মহানন্দে দিন গুণে গুণে টেনে চলেন! কোনদিন একবেলা জোটে, কোনদিন হয়তো তুবেলা জুটে গেলো। কোনদিন হয়তো স্বামী-স্ত্রীতে উপোস কোরে থাকেন। তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—শতছিদ্র সংসারের চারিদিক দিয়ে জল ঢুকছে। সর্বানন্দ নির্বিকার! দিনরাত ধর্মচর্চা। পূজার্চনা নিয়েই ব্যস্ত! মনে হয়, সবার অলক্ষ্যে কার ওপর সব কিছুর ভার দিয়ে যেন তিনি বসে আছেন।

বামাচরণ ছোটবেলা থেকেই ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়ে উঠছে। অন্য সব ছেলেরা যখন দৌড়ঝাঁপ কোরে নানান ধরণের খেলা নিয়ে ব্যস্ত, বামাচরণ তখন মাটি দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে। কখনও

কালী, কখনও শিব, কখনও রাধাকৃষ্ণ। ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, বেলা কত হোল কোন খেয়াল নেই। আপন মনে পুতুল খেলায় মগ্ন।

ছেলের দেবদেবীর ওপর এই আসক্তি দেখে মনে মনে মাতা রাজকুমারী শংকিতা হন।

পুত্র বামাচরণ একমনে বিভোর হোয়ে মূর্তি গড়ে চলে।

রাজকুমারী বোলে ওঠেন: হ্যাঁরে বামা, খাবি না, বেলা কত খেয়াল আছে কি?

বামাচরণ আপনমনেই জবাব দেয়: দাঁড়াও মা, এই চোখ দুটো ঠিক কোরে নেই। চোখ দুটো ঠিক না হোলে মা যে দেখতে পাবে না— এত কষ্ট কোরে তৈরী কোরলাম, মা যদি আমাকে দেখতেই না পায় তাকে কেমন কোরে আমি পূজো কোরব।

রাজকুমারী একটু বিরক্ত হোয়ে বোলে ওঠেন: মাটির মূর্তি কি দেখতে পায়রে। ওতো আর জ্যান্ত নয়! তুই পাগল তাই ঐ ভাবে নাওয়া খাওয়া ভুলে মত্ত হোয়েছিস।

বালক বামাচরণ কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। তার ঠাকুর জ্যান্ত নয়। এ কখনও হোতে পারে!

বামাচরণের দুচোখে অবিরাম জলের ধারা।

রাজকুমারী হকচকিয়ে যান।

বামাচরণ তেমনি ভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় আর চীৎকার কোরে কাঁদে।

রাজকুমারী তাকে শান্ত কোরতে পারেন না।

—চল্ বাবা, নেয়ে খেয়ে নিবি চল্।

বামাচরণ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বলে: না, আমি খাবো না, কিছু কোরব না।

রাজকুমারী বামাচরণের মাথাটা কোলে কোরে বোললেন: ওরে শোন্! তোর ঠাকুর জ্যান্ত।

বামাচরণ এক নিমিষে যেন জল হোয়ে যায়!……

রাজকুমারীর কোলে তেমনি ভাবে মাথা রেখে বলে: মা যদি জ্যান্ত তবে কথা বোলবে তো!

—হ্যাঁ বাবা, কথা নিশ্চয়ই বোলবে—ভক্তিভরে ডাকলে ঠিক কথা বোলবে।

বামাচরণ যেন মন্ত্র পেয়ে গেল।

ভক্তিভরে ডাকলে ঠিক কথা বোলবে মাটির ঠাকুর।

বামাচরণ মাটির মূর্তির দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

মনে হোল, সে অনেক রাস্তা পার হোয়ে গেছে এক মুহূর্তে।

যে পথের সন্ধান মানুষ যুগ যুগ ধরে তপস্যা কোরে পায় না, সে পথ বুঝি বামাচরণকে এখনই হাতছানি দিয়ে ডাক দিল!……

কাদা দিয়ে গড়া মা কালীও যেন বামাচরণের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন।

একটা কাদার ঢেলা। রং নেই, কোন আভরণ নেই, নেই মাথায় স্বর্ণখচিত মুকুট, তবুও বামাচরণের ঐ চোখে যেন রাজ-রাজেশ্বরীর মতই মনে হোচ্ছে।

বামাচরণ ধীরে ধীরে উঠে মূর্তির কাছে গিয়ে বলে: একটু দাঁড়া, আমি চান কোরে এসে পূজো দিয়ে তোর ভোগ দেবো। পেট পুরে খাস্। কিরে খুব ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি?

বামাচরণ ছুটে চলে যায় চান কোরতে।

ফিরে আসে দুটো ফুল হাতে কোরে—

কচুপাতার ওপর দুটো ফুল রেখে চলে যায় ভোগ আনতে।

ছোট একটা কলাপাতায় কোরে একটা পেয়ারা আর দুখানা বাতাসা নিয়ে এসে মূর্তির সামনে রেখে দুহাতে সব ফুলগুলো ছিটিয়ে দেয়। পরে আস্ত পেয়ারাটা মূর্তির মুখে ঠেসে ধরে বলে: কই খা, খেয়ে নে চট্ করে।

একটু থেমে বলে: খাবিনে, রাগ কোরেছিস বুঝি?

বালক বামাচরণ আর কিছু না বোলে পেয়ারাটা চিবোতে

থাকে। বামাচরণ বুঝতে সেদিন পারেনি যে খেলাছলে মহামায়া তার পূজো সেদিন গ্রহণ কোরেছিলেন।

রাজকুমারীর এসব ভাল লাগে না। এত বড় ছেলে হোল, সংসারের এই অবস্থা। কাজকর্ম কিছু না কোরলে চলবে কি কোরে? অতবড় ছেলে সংসারের বোঝা ঘাড়ে নেওয়ার সময় তো হোয়ে এলো—ছেলেখেলা কোরবার সময় আর নেই। তিনি স্বামীর কাছে অনুযোগ করেনঃ ছেলেকে কি মুখ্যু কোরে রাখবে নাকি? বামুনের ছেলে একটু আধটু লেখাপড়া না শিখলে চলবে কেন? মন্ত্রতন্ত্র একটু না জানলে যজমান ঠেকাবে কি কোরে? এখনও রাশ টেনে ধরো, নইলে সবশুদ্ধ না খেয়ে ডুবে মরতে হবে।

সর্বানন্দ ছেলের ওপর রাগ কোন সময় কোরতেন না।

বামাচরণকে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে আনন্দ পেতেন।

—কি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা! সংসারটা কি ডুবে যাবে?

সর্বানন্দ বেহালা টেনে নিয়ে আপন মনে হাসেন আর গেয়ে ওঠেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে।

বামাচরণ আনন্দে নৃত্য কোরতে থাকে।

তার অন্তর বাহির যেন ময়ূরের মত পেখম মেলে ধরে।

তন্ময় হোয়ে গান শোনে বামাচরণ। মনে হয়, যেন সে এ গান আগে কোথায় শুনেছে। এ গানের মানেও সব সে হৃদয়ে অনুভব কোরতে পারে।

সর্বানন্দ গান গায়।

বামাচরণ তেমনি ভাবে নাচতে থাকে।

রাজকুমারী রাগের সুরে বোলে ওঠেন: গানে পেট ভরবে না। সংসারের এত দুঃখের মাঝেও কি কোরে যে তোমাদের গান আসে আমি তা ভেবে পাইনে। তোমরা বাপ-বেটাতে নাচো গাও আর আমরা না খেয়ে শুকিয়ে মরি। তাহলে তোমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

একটু থেমে বোলে ওঠে রাজকুমারী: বলি আজ কি রান্না হবে, ঘরে যে একটা দানাও নেই।

সর্বানন্দ হেসে বলেন: যার ঘরে রাজকুমারী তার আবার ভাতের ভাবনা, স্বামী ভিখারী কিন্তু স্ত্রী যে রাজকুমারী!

রাজকুমারী বিরক্ত হোয়ে চলে যান।

সর্বানন্দের হাতের আঙুল আবার বেহালার তারে ঝংকার তোলে—

সকলই তোমার ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি করো মা
লোকে বলে করি আমি।
কর্মসূত্রে বেঁধে জীবে
কত খেলা খেলছো ভবে।
আমরা তোমার খেলার পুতুল
সংসার তোমার রঙ্গভূমি।

গান থামিয়ে আপনমনে পরে বোলে ওঠেন: তারা ব্রহ্মময়ী, সবই তোমার ইচ্ছে। যদি ভাবো আমরা সবাই অনাহারে থাকলে তোমার ভাল লাগে তবে তাই থাকবো পরমানন্দে।

বেলা বেড়ে চলে। সর্বানন্দ বেরিয়ে পড়েন। নিত্যকর্ম আছে দেবমন্দিরে! মা, অন্নপূর্ণার রাজত্বে যদি না খেয়ে থাকতে হয়

থাকবো। ছেলেমেয়ে উপবাসী থাকবে। কার ছেলেমেয়ে কে খাওয়ায়। সবই তো ভার দেওয়া আছে ইচ্ছাময়ীর স্কন্ধে। যার ভাবনা সেই ভাববে। অকারণ ভেবে মরা কেন!

সর্বানন্দ পথ বেয়ে চলে যান। তাঁর কণ্ঠের গান তখনও শোনা যায়—

পংকে বদ্ধ কর করি
পংগুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা অভয়পদ
কারেও করো মা অধোগামী।

রাজকুমারীর দুচোখ জলভরা। ঘরে একটা দানাও নেই। এতখানি বেলা হোয়ে গেলো, ছেলেমেয়েদের মুখে তিনি কি তুলে দেবেন। পাগলের সংসারে এ ছাড়া আর কি হবে!

রাজকুমারী দাওয়ায় বসে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মনে মনে মাকে ডাকেন। চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

এমন সময় মুহুটি গ্রামের জমিদারের সরকারের ডাক শোনা যায়—কই গো চাটুয্যে মশাই।

রাজকুমারী ঘোমটা টেনে বলেন: তিনি তো বেরিয়েছেন।

—এগুলো ঘরে তুলুন। রাণীমার আজ সাবিত্রী ব্রত, তাই তিনি এই সিধে পাঠিয়েছেন।

সরকারের পেছনে তিনটে লোক, তাদের মাথায় নানান রকম দ্রব্যসম্ভার।

রাজকুমারী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন।

সরকার মশাই পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার কোরে তাঁর হাতে দিয়ে বলেন: প্রণামীটা রাখুন।

সরকার মশাই ও বাহকেরা চলে যান।

রাজকুমারী ভাবেন, এ কি কোরে সম্ভব হোল। কোন্ অদৃশ্য শক্তি আজ তাঁদের ক্ষুধার অন্ন পৌঁছে দিয়ে গেলো। তারা মায়ের

রাজ্যে অনাহারে থাকবে তাঁর সন্তান-সন্ততি এও কি সম্ভব? রাজকুমারী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান।

ওদিকে মাঠ-ঘাট ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে আসছেন সর্বানন্দ। পেছনে বামাচরণ। শূন্য হাত, ঘরে গিয়ে নিজে কি খাবেন, ছেলেমেয়েদের কি খাওয়াবেন কোন ভাবনা নেই। মনে মনে গানের সুর ভাঁজছেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

সর্বানন্দ গানে বিভোর।

বামাচরণ ডাকছে: বাবা!

চমক ভাঙে সর্বানন্দর—কি রে—

—বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আজ কি খাবো বাবা?

—তাই তো! এতক্ষণ তো কোন খেয়াল নেই।

সর্বানন্দ হাসেন: তোর মত বোকা আর নেই। খাওয়ার ভাবনা আমরা কোরব কেন—তারা মা-ই সব ব্যবস্থা কোরবেন। তারা মা যদি আমাদের না খাইয়ে রেখে নিজে ভোগ খান তবে খাক। কোন্ মা ছেলেকে না খাইয়ে নিজে খান?

—বাবা! মাটির ঠাকুর কি অত ভোগ-নৈবেদ্য খায়? কেমন কোরে খায়?

—মা ঠিক খায়, নইলে প্রসাদ পাই কোথা থেকে? মা প্রসাদ কোরে দেয় তবেই তো আমরা খাই।

বালক বামাচরণ বোঝে না।

বোঝবার শক্তিই বা তার কোথায়? হয়তো চুপি চুপি খায়, কেউ দেখতে পায় না। মা তো আর মানুষ নন। মা যে দেবী।

সর্বানন্দ বলেন: এই বামা, কি ভাবছিস রে—

—আচ্ছা বাবা! মাটির ঠাকুর কি কথা বলে?

—বলে রে। ওসব তুই এখন বুঝবি না। যখন বড় হবি তখন বুঝবি।

—কবে বড় হবো বাবা? তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় না? তাহলে সব বুঝতে পারতাম।

সর্বানন্দ অবাক বিস্ময়ে বামাচরণের দিকে চেয়ে থাকেন।

বালক বামাচরণের হৃদয়জমিতে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছেন একজন—অংকুর তার দেখা দিয়েছে। একদিন যা ক্ষুদ্র তা একদিন বিরাট মহীরূহে পরিণত হবে। বালক তা বুঝতে পারে না।

বাড়ির কাছে এসে সর্বানন্দ অবাক হোয়ে যান রাজকুমারীকে একরাশ তরকারী কুটতে দেখে। রান্নাঘরে ভাত ফুটছে।

সর্বানন্দ অবাক হোয়ে বোললেন: এসব কোথা থেকে এলো?

রাজকুমারী শুধু বোললেন: জমিদারের সরকার মশাই দিয়ে গেলেন, রাণীমার আজ সাবিত্রী ব্রত। পাঁচটা টাকাও দিয়ে গেছেন প্রণামী বাবদ।

সর্বানন্দ চীৎকার কোরে বোলে ওঠেন: বামা, দেখলি তো, বোলেছিলাম না—যার ভাবনা সেই ভাববে। জয় মা তারা—মাগো ইচ্ছাময়ী, তোমার লীলা আমি কি কোরে বুঝবো? ধনদৌলত কিছু চাইনে মা, তোমার কৃপা যেন থাকে।

রাজকুমারী ভাত নামিয়ে বলেন: যাও, এবার চান কোরে এসো। রাণীমা যা পাঠিয়েছেন তাতে দুদিন চলে যাবে, তারপর আবার দেখা যাবে।

সর্বানন্দ তেল মাখতে মাখতে বলেন: যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন দেখবে।

—ওটার কি গতি হবে?

—বামার কথা বোলছ—তাত ঐ বেটি দেখবে। আমি কে—আমি কি দেখার মালিক, যার ছেলে সেই দেখবে।

আনন্দে একরকম নৃত্য কোরতে কোরতে সর্বানন্দ ছেলেকে নিয়ে স্নান কোরতে চলে যান।

—বাবা! মা কি আমাদের মত কথা বলেন? কই শুনতে পাইনা তো?

—তোর কথার জবাব কি দেবো—মায়ের মন্দিরে গিয়ে কান পেতে থাকিস, ঠিক শুনতে পাবি মায়ের কথা। শোন্, মায়ের ঐ মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যেই তো চিন্ময়ী মূর্তি আছে। তাঁকে জাগাতে হোলে মনে একাগ্রতা আনতে হবে। হ্যাঁরে, বাড়িতে মাকে যখন ডাকিস তখন সাড়া মেলে না? তেমনি কোরে আকুল হোয়ে ডাকতে হবে—একমন হোয়ে তাঁর ধ্যান কোরতে হবে। ডাকতে ডাকতে একদিন ঠিক সাড়া দেবেই—মা কি ছেলের কান্না বেশীক্ষণ শুনতে পারেন? কোলে তাঁকে তুলতেই হয়।

বামাচরণ পথ চলে।

সাধনার মন্ত্র তার অন্তরে ভিত পত্তন করে।

বালক বামাচরণের হৃদরাজ্যে ধীরে ধীরে এক দেবদেউল গড়ে ওঠে।

॥ ছয় ॥

দুপুরের কড়া রোদে মন্দিরের চত্বরে-বসা ভিখারীদের পয়সা দিচ্ছে সত্য। সরোজদা আর কানাইদা পূজোর প্রসাদ খাচ্ছেন। স্ত্রী মন্দিরের দরজার সামনে বাপীকে জোর কোরে প্রণাম করাচ্ছে!

দেখে হাসি পেলো। কাছে গিয়ে বোললাম: কেমন কোরে মাথা নীচু কোরতে হয় ও কি তা জেনেছে? বড় হোলে ঠিক শিখবে।

স্ত্রী মায়ের মূর্তির দিকে চেয়ে বোলল: সবাই তো আর বামাক্ষেপা নয়, যে ছেলেবেলা থেকেই দেবদ্বিজে ভক্তি শিখবে! তা আমি জানি কিন্তু মন কি বলে জানো?

—কি?

—ওকে আমি মার চরণে ফেলে যদি নিশ্চিন্ত হোতে পারতাম। দেখলে তো একজনকে আঠারো বছর ধরে বড় কোরে তাকে তো ধরে রাখতে পারলাম না। তাই মনে মনে বাপীকে মার ওপরই ভার দিলাম।

স্ত্রী চোখে কাপড় ঢাকা দিল।

শুধু তাকালাম স্ত্রীর দিকে—

—এখানে না এলেই বোধ হয় ভাল হোত। কই শান্তি পাচ্ছি না তো! মা আমার এ কি সর্বনাশ কোরলেন—আমি কি দোষ কোরেছি। মা কি পায়ের তলায় তাকে রাখতে পারতেন না?

—মাকে ডাকবার অবসর তো তোমার ছিল না, তাই মা তোমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। দুঃখ কোর না—যে গেছে সে তো মায়ের কোলেই জায়গা পেয়েছে।

স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সত্য এসে স্ত্রীর কোল থেকে বাপীকে নিয়ে বোললে: বৌদি!

পৃথিবীতে এসে কি শুধু সুখই চান, শান্তি চান।—দুঃখ-কষ্টও তো একটু আধটু ভোগ কোরতে হবে। সুখী এ দুনিয়ায় কেউ নেই। সবার বুকেই দাগ আছে।

আকাশে মেঘ দেখা যায়।

টুকরো টুকরো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়।

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাপীকে কোলে তুলে নেয়।

সত্য হো হো কোরে হেসে ওঠে।

সরোজদা বোলে ওঠেন—হাসছো কেন সত্য ?

—বৌদির ভাব দেখে—মায়ের মন্দিরে বসেও এত ভয়! মেঘ দেখে বাচ্চাটাকে চট কোরে কোলে নিলেন! যিনি সারা বিশ্বের মানুষকে আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছেন তাঁকেও অবিশ্বাস।

সরোজদা একমনে ফজলী আমের আঁটি চুষছেন।

মনে হোচ্ছে যেন উনি ওতে অমৃতের আস্বাদ পাচ্ছেন। তাই ফেলতে আর ইচ্ছে হোচ্ছে না।

কানাইদা সেই যে বসেছেন মন্দিরের একপাশে আপন মনে—তাঁর যেন কোন সাড়া-শব্দই নেই!

এমন সময় একদল যাত্রী এলো। শুনলাম তাঁরা বর্ধমান থেকে এসেছেন। সংগে অনেক মেয়েছেলে। অনেক দিন পর বড়ছেলের ছেলে হোয়েছে, তাই এসেছেন তারাপীঠে মায়ের ভোগ দিয়ে সেই প্রসাদান্ন দিয়ে নবজাতকের অন্নপ্রাশন দিতে।

মায়ের মন্দিরে মানুষ আসার যেন কামাই নেই। মা ডেকেছেন, তাইতো সবাই জড় হোয়েছে; বাপী মন্দির-চত্বরে খেলে বেড়াচ্ছে—কখনও কাঁদছে, কখনও হাসছে, কখনও মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বিশ্বজননীর সংসারে আমরাও তো খেলছি ঠিক বাপীর মত। কখনও সুখের জোয়ারে ভাসছি, কখনও দুঃখের বন্যায় ভাসছি। পারছি না শুধু ঝাঁপিয়ে পড়তে মায়ের চরণে।

কারা যেন পেছন থেকে টেনে ধরে ; এ মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারে কজন ? তাইতো মায়ের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি না।

স্ত্রীকে বোললাম : প্রাণভরে মায়ের নাম করো, মাতে আর তোমাতে কোন তফাৎ থাকবে না। যত নাম কোরবে ততই মনে হবে মা-ও যা তুমিও তাই। অনিত্য জিনিস নিয়ে কেঁদে খুন হোয়ে আর জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট কোর না। এ দুনিয়ায় নামই থাকবে, আর ঐ যে মন্দিরের ভিতর বিরাজমানা—উনিই পরম বস্তু, চিরকাল থাকবেন—তাঁরই শরণাপন্ন হও।

সত্য এসে বোললে : কি বোলছেন দাদা বৌদিকে ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বোললাম : সত্য, কি আর বোলব—শুধু বোলছি জীবনের তিনভাগ তো এমনি এমনিই কেটে গেলো। ছেলে-মেয়ে ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব অর্থ ঐশ্বর্য এসবের চিন্তাই তো জীবনটাকে কুরে কুরে পারের ঘাটে নিয়ে চললো—এই জীবন-তরীর মাঝিকে পার হওয়ার সময় কি জবাব দেব ?

কানাইদা উঠে দাঁড়িয়েছেন কখন তা টের পাইনি।

বোললেন : আমরা আর জবাব দিয়েছি ! বামাক্ষেপার কুকুরগুলো মনে হয় তাঁর সান্নিধ্যে জীবন কাটিয়ে স্বর্গে চলে গিয়েছে। আমরা তাদেরও অধম।

সত্য জবাব দিলো : ঠিক বোলেছেন, আমরা ছিলাম অন্ধকারে। যতদিন বাঁচবো অন্ধকারেই অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াবো, শেষেও সেই চির অন্ধকারের গর্ভেই বিলীন হোয়ে যাবো। এ জীবনে আলো আর দেখতে পেলাম না।

সরোজদা আঁটিটা জংগলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বোললেন : খাওয়ার লোভই ছাড়তে পারলাম না বুড়ো বয়স পর্যন্ত, এমনভাবে আঁটিটাকে খেয়েছি পিঁপড়েও ওতে আর এক ফোঁটা কিছু পাবে না। একটু থেমে বোললেন : বুঝলে সত্য ! এই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে শুধু ইচ্ছে করে যে, মা তারাকে যদি সামনে পেতাম তাহলে

বোলতাম—মাগো, তুমিই তো আমাকে ছুনিয়ার আলো দেখিয়েছো, তবে জ্ঞান দাওনি কেন, ভক্তি দাওনি কেন, আর দশজন ভক্ত পাঠকের মত কৃপাই বা আমাকে কোর না কেন? মহাপাপী যদি হোয়েই থাকি তার জন্যও তো তুমি দায়ী মা।

সত্য জবাব দিলো: এর জবাব সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপার কথার মাঝেই পাবেন। গীতায় শ্রীভগবান বোলেছেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

[—গীতা

॥ সাত ॥

বামাচরণ যতই এগিয়ে চলে রাজকুমারী ততই যেন তাকে জোরে টেনে ধরে। লেখাপড়া শেখার দিকে তিনি জোর দেন। শিক্ষাদীক্ষা না পেলে মানুষ হবার কোন আশা নেই, বংশের মান-মর্যাদা যদি ধুলায় লুটায়, তাহলে সে ছেলে কোন্ কাজে লাগবে? তিনি দিনরাত মা তারার কাছে কাতরভাবে বামাচরণের সুবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।

বামাচরণের বই ভাল লাগে না। স্লেট ভর্তি কোরে আপন মনে আঁকে মা কালীর ছবি। বার বার মোছে আর বার বার আঁকে। যেন মনের মত হয় না।

রাজকুমারী ভাবেন তার স্লেট হাতে দেখে যে, ছেলের বুঝি লেখাপড়ায় মন বসেছে। যাক মা তারা তার কথা বোধহয় শুনতে পেয়েছেন। মানুষের ছেলে কত লেখাপড়া শেখে, কত বিদ্বান হয়, লোকে কত ভালবাসে। তার বামাও ঠিক মানুষ হবে।

রাজকুমারী আদর কোরে ডাক দেন : হ্যাঁরে বামা! ক'খানা আঁক কসলি বাবা? পারিস তো—

বালক বামাচরণ হাসে—হ্যাঁ, পারি বইকি। শুধু হাত ছটো ছোটবড় হোয়ে যায়।

—হাত! অংকের আবার হাত কিরে?

—হ্যাঁ মা! একটা হাত এই দেখো ছোট হয়ে গেছে, আর একটা হাত কত বড় হোয়ে গেছে!

রাজকুমারী স্লেটটা হাতে নিয়ে দেখেন যে সারা স্লেটে মায়ের ছবি।

রাজকুমারীর মুখখানা যেন কালি হোয়ে যায়।

মুখে কোন কথা নেই।

বামাচরণ বলে : লেখাপড়া শিখে কি হয় মা ?

রাজকুমারী তবুও কথা বলেন না। তার সব আশা ভরসা যেন ভরাডুবি হোয়ে যায়।

বামাচরণ আবার বলে : বলনা মা, লেখাপড়া শিখে কি হয় ?

রাজকুমারী রাগ কোরে বোলে ওঠেন : পাঁঠা হয় !

—তাহলে তো খুব ভাল হয়—আমাকে বলি দিও মা, মা-তারার কাছে।

বামাচরণ আনন্দে নৃত্য কোরতে থাকে।

গ্রামের লোক সর্বানন্দকে ডেকে বলে : চাটুয্যে, তোমার ছেলেটা কি শেষকালে বাউড়ে হোয়ে যাবে—দিনরাত যেমন মাঠে-ঘাটে ঘোরে তাতে মনে হয় ওর লেখাপড়া শেখার দফা গয়া হোয়ে না যায় ! এখনও সময় আছে রাশ টেনে ধরো ; নইলে ছেলে বয়ে যাবে।

সর্বানন্দ বলেন : যা হয় হোকগে, সবই মায়ের ইচ্ছা।

যিনি মাটিতে আবির্ভূত হোয়েছেন লোককে শিক্ষা দেবার জন্য, যিনি ধর্মের গ্লানি দূর কোরবার জন্য মানুষের বেশে মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, যিনি মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণ বিকাশ কোরবার জন্য এ ধরাধামে এসেছেন, তাঁর লেখাপড়া হোল না হোল তাতে কি আসে যায় ! তিনি তো ছাত্র হোতে আসেননি, তিনি এসেছেন শিক্ষাগুরু রূপে। চৈতন্যশক্তির আধার যাঁর বক্ষপুটে তাঁর আর পুঁথিগত বিদ্যা না শিখলেও হবে।

আটলার মানুষ তাকে চিনবে কি কোরে ? তাকে বুঝবে কি কোরে ? সে-চোখ এখনও কারও ফোটেনি !

বামাচরণ তার বালক সুলভ চাপল্যের বশেই মাকে বলে : ও মা ! আমি বড় হোলে মায়ের কাছে বলি দেবে তো ?

রাজকুমারী ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলেন: বালাই ষাট, তোকে আমি বলি দিতে যাবো কেন?

—কেন, তুমি যে বোললে আমি পাঁঠা হ'বো!

—দূর বোকা! তাই আবার হয় নাকি—

বামাচরণ বলে ওঠে: আমি কিন্তু বলি হবোই মা, মায়ের খাঁড়াতে খুব ধার, তাই না মা! বেশ হবে—আমি বলি হ'বো।

পাঠশালার পণ্ডিতমশাই এসে অনুযোগ করেন সর্বানন্দর কাছে: চাটুয্যে, তোমার দুটো ছেলের কোনটারই মানুষ হবার আশা নেই। ওদের দিকে একটু নজর দাও, বলি—ছেলেমেয়ে তো তোমার কম নয়—আজ যদি তুমি চোখ বোজ এতবড় সংসারটা যে ভেসে যাবে, মেয়েগুলো বড় হোয়ে যাবে—তাদেরই বা কি গতি হ'বে?

রাজকুমারী ঘোমটা টেনে বলে ওঠেন: বামাটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন পণ্ডিতমশাই—আপনার কাছে দিয়ে ও যদি মানুষ না হয় তাতে তো আপনারই গৌরব নষ্ট হবে।

—সব কি আর ভাল হয় মা—তোমার বামার কীর্তি শোন একবার: সেদিন কড়াকিয়া লিখতে দিয়েছিলাম। তোমার ছেলে তার বদলে এঁকে নিয়ে এলো এক কালীমূর্তি। বলি, এসব শিখলো কোথায়? এই বয়সে এত পেকে গেলে তার কি কিছু হওয়ার আশা আছে, না হোতে পারে?

মা-তারা মন্দিরে বসে বোধহয় আপন মনে হাসছেন আর বোলছেন—মূর্খ পণ্ডিত, আমার বামাকে চিনতে হোলে আগে লক্ষ জনম পণ্ডিতগিরি করো—তারপর ওকে চিনতে চেষ্টা কোরো, ও শিখতে আসেনি, শেখাতে এসেছে।

পণ্ডিতমশায় যাবার বেলায় সর্বানন্দকে আর একবার বোলে যান: ওহে চাটুয্যে! নিজেও পাগলামী কোরে গান গেয়ে কাটিয়ে

দিলে আর ছেলেটাকেও পাগল সাজালে—বলি, ছেলেটা তো তোমার।

সর্বানন্দ যেন ভাবে বিভোর, নিজে পাগল বোলেই তো ছেলেও পাগল। মন্দিরের ঐ পাগলী বেটির সংসারটাই তো পাগলের আড়ৎ। লাভ যে বেশী কোরতে পারে এই ভবের হাটের দোকানদারীতে সেই তো মহাজন ঐ কালী বেটির কাছে আরও মাল ধারে পায়। লোকসান যে করে সে কোন্ মুখে আর মহাজনের সামনে দাঁড়াবে।

সর্বানন্দ আপন মনেই আবৃত্তি করেন :

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং
চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

সর্বানন্দর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

চোখ মুছতে মুছতে বলেন : মা তারা! আর নয়, এবার রাঙা চরণে একটু আশ্রয় দে! সংসার সংসার খেলা অনেক খেললাম। বড় ক্লান্ত।

বামাচরণ তেমনি ভাবে রোজই পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় কোন মন নেই। কালো স্লেটটা হাতে নিলেই তার মা-তারার কথা মনে পড়ে। তার মা তারারও তো ঐ রং।

পণ্ডিতমশায় ডাকেন : ওরে বামা হতচ্ছাড়া, লেখা নিয়ে আয়। দামড়া মিনসে তোর কি একটুও লজ্জা সরম নেই?

বামাচরণ কোন কথাই যেন শুনতে পাচ্ছে না—

গভীর ভাবে যেন তন্ময় হোয়ে বসে কি লিখছে। সবার লেখা দেখানো হোয়ে গেলো কিন্তু বামাচরণ ওঠে না। তার সমস্ত জগৎ ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান, মা-বাবা-ভাই-বোন, সুখ-দুঃখ যেন ঐ কালো স্লেটে গিয়ে ঘর বেঁধেছে।

পণ্ডিত মশাই বেত নিয়ে রুখে এলেন। দাঁড়া; তোর পাগলামী আজ বেতের ঘায়ে বার কোরছি!

বামাচরণ যেন মহাযোগীর মত ধ্যানে বসেছে। পৃথিবীর কোন কিছুই যেন তার স্মরণপথে মননপথে আসছে না! সে কে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কোথায় সে আছে, তারও কিছু খেয়াল নেই।

পণ্ডিত মশায়ের হাত থেকে বেত পড়ে গেলো। বামাচরণের হাত থেকে শ্লেটটা ছিনিয়ে নিয়ে চমকে গেলেন—একি! এযে তারা মায়ের অবিকল রূপ—এই তো মাথায় মুকুট, এই তো পরনে তার রক্তবস্ত্র, গলায় রক্তজবার মালা, রাঙাপায়ে রক্ত-আবীর। বরাভয়-দায়িনী মাকে শ্লেটে এনে ধরেছে বামাচরণ।

—বামা! বামাচরণ—

কোন সাড়া নেই। যেন সমাধিস্থ।

পণ্ডিত মশায় বোললেন: ওরে, শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়, বামা মূর্চ্ছা গেছে।

খবর পেয়ে রাজকুমারী ছুটে আসেন। আসে গ্রামের মেয়েরা। বামাচরণ কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ায়।

পণ্ডিত মশায় বলেন: বামা! তুই বাড়ি যা। তোকে আমি একেবারে ছুটি দিলাম। আমার পাঠশালার পড়া তোর শেষ হোয়েছে। বাবা, তুই কে তা আমি জানি না, যেই হোস আমার কথা একটু স্মরণ রাখিস, শেষের দিনে একটু পথ দেখাস। কি ভাগ্য আমার।

বামাচরণ অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে চায়।

তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—

রাজকুমারী কেঁদে ওঠেন: ও বামা! কথা বল্, তোর হোল কি?

বামাচরণ কোন কথা বলে না।

শ্লেটটা মাথায় নিয়ে মায়ের সাথে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। শ্লেটে সেই মা তারার মূর্তি।

॥ আট ॥

সংসার যে চায়না—তাকে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার আছে। রাজকুমারী মনে মনে বুঝতে পারেন ধীরে ধীরে। সংসার বামাচরণকে পাবে না। বামাচরণ এ সংসারের কেউ হবে না একথা সুপণ্ডিত সর্বানন্দ অনেকদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন। নবদ্বীপের শচীমাতাও যখন নিমাইকে গর্ভে ধারণ করেন সেদিন তাঁর মনের ভাবও ঠিক রাজকুমারীর মতই হোয়েছিল।

রাজকুমারী তাই বামার কথা আর সর্বানন্দর কাছে কিছুই বলেন না। সর্বানন্দ যেন বামার কোন নিন্দা সহ্য কোরতে পারেন না। তাঁর বুকটা যেন ভেঙে চৌচির হোয়ে যায়।

রাজকুমারী স্বামীর দিকে চেয়ে বোলে ওঠেন : তুমি কি বলতো? পরনের কাপড়খানার দিকে চেয়ে দেখেছো? কত যায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ওটাকে ছেড়ে ফেলে সেদিন জমিদার বাড়ি থেকে রাণীমা যে কাপড়টা দিয়েছে সেইটে পরো, আমি আর তোমাদের নিয়ে পারিনে। মা কি আমাকে চোখে দেখেন না?

সর্বানন্দ হাসেন : হ্যাঁ! এবার এ জীর্ণ কাপড় ছেড়ে ফেলবার সময় হোয়ে এসেছে। আমি বুঝতে পারছি, এটাকে ছেড়ে এবার নোতুন কাপড় পরতে হবে।

সর্বানন্দ হাসতে হাসতে সুর কোরে পাঠ আরম্ভ করেন :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।

[—গীতা ২।২২

সংসারের এই চরম ঘূর্ণিপাকের মাঝে একদিন ওপার থেকে ডাক এলো সর্বানন্দর। তার মা তাকে ডাক দিয়েছেন। মায়ার বেশবাস - সব খুলে ফেলে তাকে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন।

অসুখ নেই বিসুখ নেই হঠাৎ একদিন সর্বানন্দ বিছানায় শুয়েই বোললেন: আমি তো এবার চলছি—কিছু ভেবো না, মা তারা রইলেন, তিনিই দেখবেন, এতদিনও তিনি দেখেছেন, এখনও তিনি দেখবেন।

রাজকুমারী চোখের জল ফেললেন না। পাথরের মত বসে রইলেন স্বামীর শিয়রে।

বামাচরণ কিছু বোললে না, কান্নাকাটিও কোরল না। সে যেন সর্বজ্ঞ। সে যেন জানে—এর জন্য কেঁদে লাভ নেই। জন্মালেই তো মরণ তার আছে—তবে দুঃখ কিসের? আত্মার মরণ নেই—দেহটাই চলে যায়। এ সংসারের মানুষের দেহ অন্ত প্রাণ, আত্মার জন্য কেউ চিন্তা করে না। আত্মার চিন্তা কোরতে হোলে যে জ্ঞান যে তীতিক্ষার দরকার হয় তা এ শোকতাপদগ্ধ মানুষের কোথায়? তাইতো মৃতের জন্য এত শোক এত হা-হুতাশ।

বামাচরণ কি এসব জানে, এসব বুঝে—তাইতো চোখের সামনে পিতার মৃত্যু দেখেও তার চোখে জল এলো না কেন—সে কি জানে? সে জ্ঞান কি তার হোয়েছে?

বামাচরণ জানে—মা তারাই হয়তো তাকে অন্তরে অন্তরে লেপন করে দিয়েছেন গীতার সেই অমূল্য নির্দেশ:

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি-পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ

[—গীতা ২।২৩ ॥

॥ নয় ॥

সর্বানন্দ মারা যাবার পর রাজকুমারী চারিদিকে অন্ধকার দেখলেন। এতবড় সংসার—রোজগার নেই একপয়সাও, অথচ এতগুলো পেট চলবে কি কোরে? সংসারে একমাত্র আশা ছিল বামাচরণ, কিন্তু সেতো কোন কিছুরই ধার ধারে না। দিনরাত শুধু ঘুরছে, কখনও তারাপীঠের মন্দিরে—কখনও শ্মশানে, কখনও দ্বারকা নদীর ধারে।

সংসারে তার কোন দাবী নেই। মা যদি ডেকে কিছু দিল তবে খেলো, নইলে উপবাসেই হয়তো সারাদিন কেটে গেলো। রাজকুমারী তারা মায়ের কাছেই দুঃখ জানান। বিশ্বজননী যখন, তখন সন্তানদের অভুক্ত রেখে কি কোরে তিনি ভোগ গ্রহণ কোরবেন?

জাগ্রত জননী মা তারা সবই দেখছেন দুচোখ দিয়ে। বামার কথাও তিনি ভাবছেন বৈকি। মুহুটি গ্রামের কালীবাড়ীতে তার একটা কাজ জুটে গেলো। মায়ের পূজার ফুল তোলার কাজ। রাজকুমারী একটু আশার আলো দেখলেন। জীবনে যার সব বাতি নিভে গেছে, হঠাৎ যদি একটা আলো তার জ্বলে ওঠে তাতেও তো সংসারে কিছুটা আলো হবে।

ফুটন্ত রক্তজবা দেখে বামার মন যেন কেমন হোয়ে যায়। রোজই তো ঐ রক্তজবা মায়ের চরণে আশ্রয় পায়। কি সৌভাগ্য ঐ রক্তজবার। বামাচরণের ফুল তোলা থেমে যায়—গাছের ডাল ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে। কি এমন সাধনা ঐ রক্তজবা কোরেছে যে রোজ মায়ের চরণ পায়!

ওদিকে পূজোর দেরী হয়ে যায়। পুরোহিত ছুটে আসেন

বাগানে—দেখেন, বামা গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।

পুরোহিত গালাগালি দেন: কোথাকার একটা হনুমান এসেছে এখানে—এবার আমাকে পাগল না কোরে দেখছি ছাড়বে না। মেরে তোর হাড় ভেঙে দেবো।

নালিশ জানালেন তিনি নায়েবের কাছে। নায়েব সব শুনে বোললেন: পুরুত মশাই, সবাই যদি ওকে দূর ছাই করেন তাহলে ও যাবে কোথায়! জানেন তো ওদের সংসারের কি অবস্থা!

একটু থেমে বলেন: এক কাজ করুন, ওকে বরং ভোগ রান্না কোরতে দেন। বামুনের ছেলে নিশ্চয়ই ভাল পারবে।

বামাচরণ ভোগ রান্না শুরু কোরে দিল। কিন্তু কোনদিন যে ও কাজে অভ্যস্ত নয় সে কি কোরে পারবে ঐ কাজ। রান্না চড়িয়েই তারা মায়ের মুখখানা ভেসে উঠলো তার সামনে। রান্না পুড়ে যায়। বামাচরণ তখন রামপ্রসাদী সুর ধরেছে—

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।"......

পোড়া গন্ধে চারিদিক ভেসে যায়। পুরোহিত ছুটে এসে বামাচরণকে শুধু প্রহারটা বাদ দিয়ে অকথা গালাগালি কোরতে কোরতে দূর কোরে দেন।

মুক্তি পেয়েছে বামাচরণ—

মুক্তির আনন্দে একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ির পথ ধরে। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এই তো চেয়েছিল সে। গরুর মত গলায় দড়ি পড়েছিল তার। মা তারা-ই তার বাঁধন খুলে দিয়েছেন। তারা মায়ের মন্দিরে বসে গান গাইলেই তার দুটো প্রসাদ মিলবে, তাতেই তার হোয়ে যাবে।

ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সরু একপেয়ে পথ। কিছু আগেই

বুঝি বৃষ্টি হয়ে গেছে। কোন কোন যায়গায় জল জমে রয়েছে। বামাচরণ আনন্দে ছুটছে—কখনও পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছে। মা তারা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই !···

বামাচরণ বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই বোলে উঠলো : মা, মাগো, আমাকে তাড়িয়ে দিল। শুধু মারেনি, আমি চলে এলাম।

উঠানের উপর দাঁড়িয়েছিলেন একজন অপর মানুষ। বামাচরণ কোনদিন তাঁকে দেখেওনি।

তিনি বোলে উঠলেন : বেশ কোরেছো বাবা চলে এসেছো।

রাজকুমারী বোললেন : বামা ! উনি তোমার মামা হন, গুরুজন, প্রণাম করো।

বামাচরণ প্রণাম করে।

আটলা গ্রাম থেকে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে নবগ্রাম। বামাচরণের মামার বাড়ি। রাজকুমারী বড়, হেমচন্দ্র ছোট ভাই। লোকমুখে খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন।

হেমচন্দ্র বোললেন : দিদি ! ওদের তাহলে যাবার ব্যবস্থা কোরে দাও। জামাইবাবু নেই কিন্তু আমি তো আছি। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ ওদের তো আর ভেসে যেতে দিতে পারি না ! তুমি কিছু ভেবো না, আমি ওদের মানুষ কোরব। ওরা মানুষ না হোলে আমি মামা, আমার মুখেও তো চুনকালি পড়বে।

—তাতো ঠিক ভাই—ওরা মানুষ হোলে আমার আর দুঃখ কি !

বামাচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনে আর ভাবে—আবার বাঁধন—

মায়ার মোহের ! সংসারটা মায়ার সুতো দিয়ে জড়ানো। কালে কালে যুগে যুগে চলছে এই মায়ার খেলা। সারা বিশ্বটা জুড়ে ছেয়ে রয়েছে মায়ামমতার চন্দ্রাতপ। এরই তলায় মিলেছি

আমরা সবাই। বিশ্বজননী মায়াবদ্ধ কোরেই মানুষকে হাসাচ্ছেন, কাঁদাচ্ছেন। এ বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া সবার ক্ষমতায় কুলায় না। তাইতো কাউকে পেয়ে হাসছি, আবার কাউকে হারিয়ে কাঁদছি।

বামাচরণ ছটফট করে। একি হোল মা! বাঁধন খুলে যাচ্ছে, আবার বেঁধে দিচ্ছিস নতুন কোরে। সারাজীবন যদি জট পাকিয়ে আর গিট খুলেই কেটে যায় তাহলে তোকে আর ডাকা হবে না।

রাজকুমারী বামাচরণকে বলেন: ওরে! দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি? দুটো পেট ভরে খেতে যদি চাস তৈরী হোয়ে নে—কাল দিনটা ভাল আছে। কালই রওনা হোতে হবে।

হেমচন্দ্র বোলে ওঠেন: সেই ভাল দিদি। তাছাড়া তোমার ছোট ভাজ্ আবার পথ চেয়ে বসে আছে। জামাইবাবুর গত হওয়ার কথা শোনার পর থেকে সে যেন অন্যরকম হোয়ে গেছে। চোখের জল তার শুকাচ্ছেই না।

ভায়ের এমনি ধারা দরদীমনের পরিচয় পেয়ে রাজকুমারীর হৃদয় গলে যায়। তিনি তৈরী হোতে থাকেন।

বামাচরণের কিন্তু ভাল লাগে না। তারা মায়ের মন্দির ছেড়ে সে এ দুনিয়ার কোথাও যেতে চায় না। ঐ দূরে দ্বারকা নদী, তার পাশে শ্মশান, এসব ছেড়ে যাওয়া যে কী কষ্টকর তা সে বেশ ভালভাবেই জানে! কিন্তু উপায় নেই—মায়ার সংসার। এখানে পেট আছে! পেট না চললে হাত-পা চলবে না।

পেটসর্বস্ব মানুষের ভগবানকে ডাকবার সময় কোথায়? তাই পেটও কারও ভরে না।

হেমচন্দ্রের পত্নী কাত্যায়নী সোজা মানুষ নন। তিনি এদের দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন: গরু বাছুর ছাগল ভেড়া সংগে কিছু আসেনি?

হেমচন্দ্র ইসারায় চুপ কোরতে বোললেন স্ত্রীকে।

কাত্যায়নী রান্নাঘর ছেড়ে দিয়ে রাজকুমারীকে ঢুকিয়ে দিলেন। বামাকে দিলেন ক্ষেত থেকে ফসল নিয়ে আসবার ভার। বামাচরণ অতবড় মোট কি বইতে পারে? হেমচন্দ্রের প্রচুর সম্পত্তি—কিন্তু থাকলে কি হবে, সেই তুলনায় মন অনেক ছোট।

বামাচরণ মোটা মোটা ধানের বোঝা মাথায় কোরে নিয়ে আসে। রাজকুমারী দেখেন আর তাঁর বুক ফেটে যায়। ঐটুকু ছেলে ওর কি মাথায় এত বোঝা দিলে বইতে পারে!

একদিন মোট মাথায় কোরে নিয়ে আসতে আসতে বাড়ীর কাছে ঘাড় মটকে পড়ে গেলো। শুকনো একটা ডালে লেগে তার মাথাটা কেটে গেলো। রাজকুমারী দৌড়ে গেলেন। তিনি কেঁদে উঠলেন—না, এবার ছেলেটা মরেই যাবে।

কাত্যায়নী মুখ ভেঙচে উঠলেন: মরে যাবে না হাতি—অতবড় বুড়ো মিনসে খাটবে না তো কি বসে বসে গিলবে! যেমন বাপটা ছিল সর্বনেশে অনামুখো, ছেলেটাও হোয়েছে তাই।

রাজকুমারী ক্রোধে ফেটে পড়েন: তিনি স্বর্গে গেছেন আবার তাঁকে এর মধ্যে টেনে আনছো কেন? তাছাড়া আমরা তো আর কেউ বসে খাচ্ছি না।

রাজকুমারী কাঁদেন আর বামার মাথায় হাত বোলান। স্বামীর কথা মনে পড়ে—তিনি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁর নাম সর্বানন্দ।

রাজকুমারী চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে থাকেন। বামাচরণ চোখ মেলে তাকায় আর বলে: মা, তুমি কাঁদছো! বাবা তো চলে গেছেন। মা তারাই আমাদের দেখবেন। মা তারা যখন আমাদের ভার নিয়েছেন তখন আর কান্না কেন?

একটু থেমে বলে: মা! তার চেয়ে বরং চলো আমরা চলে যাই। এখানে তোমার বড় কষ্ট। মামীমা আমাদের মোটেই চোখে

দেখতে পারেন না। চল আমরা আটলা চলে যাই—সেখানে মা তারা আছেন।

—তাই যাবো বাবা। তুই একটু সুস্থ হোয়ে নে।

বামাচরণের মন যেন চলে যায় তারাপীঠে—

মায়ের পূজো আরম্ভ হোয়েছে—কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। উঠে পড়ে মাঠের দিকে চলে যায় বামাচরণ। সন্ধ্যা তখনও হয়নি।

সূর্যদেব ঢলে পড়ছেন পশ্চিম দিগন্তে। যেন মায়ের কোল পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সোনালী ধানে মাঠ ভরে রয়েছে। বামাচরণ একটা উঁচু ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে অনেক দূর চেয়ে দেখে। না, এখান থেকে তারা মায়ের মন্দিরের চূড়া দেখা যায় না।

বামাচরণ এবার একটা আমগাছে উঠে পড়ে। উঁচু একটা ডালে বসে চারিদিক তাকায়! অনেকদূর মা রয়েছেন। তারাপুরের লম্বা লম্বা তালগাছগুলো মন্দির ঢেকে রয়েছে।

বামাচরণ গান ধরে—

"আমায় দাও মা তবিলদারী
আমি নিমক হারাম নই মা শংকরী।
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখো তারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর। তবু শিবের মাইনে ভারী।
আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।"

বামাচরণ গানে বিভোর! সে কোথায় বসে আছে তা'ত তার খেয়াল নেই। এখান থেকে পড়ে গেলে যে তার হাড় গুঁড়ো হোয়ে যাবে সে ভাবনাও তার নেই।

তাই বুঝি হয়—অভয় পদে মন প্রাণ সমর্পণ কোরলে তার বুঝি আর কোন চিন্তা থাকে না।

একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে রয়েছে বামার সামনে। বামার চোখ দুটো যেন বোজা।

নীচ দিয়ে যাচ্ছিল নবগ্রামের একজন লোক। সে নীচ থেকে ওপরে তাকিয়ে দেখে চমকে উঠলো!

কি সর্বনাশ—কে যেন বসে আছে ডালের ওপর, আর একটা বিরাট সাপ পরমানন্দে মাথা দোলাচ্ছে।

মনে হোচ্ছে যেন সে বোলছে—বামা, আবার গাও শুনি মায়ের নাম, শুনে এই সর্প জনম ধন্য করি।

লোকটি চীৎকার কোরে উঠলো : এই, গাছে কে রে, শীগ্‌গির নেমে আয়, সাপের হাতে মরবি যে!

তবুও কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকে : কে রে! মরতে এসেছিস? তোকে সাপে খেলো যে!

বামাচরণের চমক ভাঙে।

তার সামনে একটা সাপ ফণা তুলছে। বামার কোন ভয় নেই।

বামাচরণ বোললে : মা তারার কাছে যা—

সাপটা ধীরে ধীরে অন্য ডালে উঠে গেলো।

বামাচরণ নেমে এলো।

—ওমা. এ যে হেমচন্দ্রের ভাগনে বামা। হ্যাঁরে, ওখানে উঠেছিলি কেন? আর একটু হোলেই তো সাপের হাতে মরতিস।

বামাচরণ হেসে বলে : মরিনি তো!

—মরিনি তো! বলি, ছোবলটি মারলে যে আর মায়ের মুখ দেখতে হোত না।

বামাচরণ হাসে।

লোকটি বলে : যত পাগলের আমদানী হোয়েছে। বোলেই সোজা পায়ে হেঁটে চলে যায়।

বামাচরণ বাড়ির দিকে মুখ ঘোরায়।

সন্ধ্যা নামছে। মানুষের জীবনের সন্ধ্যা, যৌবনের সন্ধ্যা। বামাচরণ জোরে পা চালিয়ে দেয়। কোথায় যেন শংখ বাজছে। এতক্ষণ তারাপীঠেও মা তারার আরতি হোচ্ছে। ঐ তো মায়ের মুখখানা ধূপধুনোতে ভরে গেছে। ঐ তো মা তাকিয়ে তাকিয়ে ভক্তের আরতি গ্রহণ কোরছেন। কি সুন্দর! এমন দৃশ্য দুনিয়ায় আর কোথায় মিলবে? ভক্ত ডাকছে ভগবানকে, ভগবান কান পেতে শুনছেন, আর হাসছেন। এখনই সাড়া দিলে তবে আর ডাকবে না, আকুল হোয়ে বারে বারে ডাকুক, ডেকে ডেকে স্বরভঙ্গ হোক, চোখ অন্ধ হোক তখন সাড়া দিলেই হবে!

ভক্ত আর ভগবানে লুকোচুরি খেলা চলছে—

বামাচরণ চোখ বোজে।

শুধু অন্ধকার।

আলো দেখা মা একটু আলো। চোখ থাকতেও এমন কানা হোলাম কেন? চোখ দিয়ে তোকেই যদি দেখতে না পেলাম, বুঝতে না পারলাম, তাহলে কানা ছাড়া আর কি! আমাকে আলো দেখা।

বামাচরণ কাঁদছে। চুপি চুপি নিঃশব্দে।

রাতে হেমচন্দ্র বলেন: কাত্যায়নী! ঝগড়াঝাঁটি কোরে সব কিছু মাটি কোরে দিও না।

পরে চুপি চুপি স্ত্রীকে বলেন: একটু অপেক্ষা করো, জামাইবাবুর জমিজমাগুলো আগে নিজের নামে কোরে নেই তারপর ওদের সব দূর কোরে দেবো।

স্বামীর বুদ্ধিতে কাত্যায়নী খুব খুশী হন।

তার পরদিন থেকে দেখা গেলো কাত্যায়নী অন্যরকম হোয়ে গেছেন। বামাচরণকে আর মোট বইবার কাজ তিনি দিলেন না। তাকে গরুর পেছনে বহাল কোরলেন। দিনরাত গরু-বাছুরের তদারক করাই তার কাজ হোল।

কাত্যায়নী এক নিমেষে যেন বদলে গেলেন। বামাচরণকে ডেকে এটা ওটা খেতে দেন। বামাচরণ খুশী হয়। গোয়াল ঘরে বসে বসে মুড়ি চিবোয় আর ভাবে—বাবার কাছে সে শুনেছে শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনে রাখালের মত গরু চরাতেন। তবে সেই বা তা পারবে না কেন? মনে তার কত কথাই ভেসে আসে—

গ্রামে যাত্রাগান হবে। রামবনবাস পালা। রাম ও লক্ষ্মণ সাজে বামাচরণ আর রামচন্দ্র। পরিচালক সর্বানন্দ বেহালা বাদক। রামবনবাস পালা শুনে কত লোক কেঁদেছে! সর্বানন্দর বেহালার করুণ সুর এখনও যেন মুর্চ্ছনা তুলছে।

সর্বানন্দকে কেউ ডাকে—চাটুয্যে, কেউ ডাকে পাগলা ঠাকুর।

বামাচরণ রাগ করে। বাবাকে পাগলা বোললে কোন্ ছেলের ভাল লাগে?

সর্বানন্দ বলে ওঠেন: ছিঃ বাবা, ওদের ওপর কি রাগ কোরতে আছে? বামা, ক্রোধই হোচ্ছে মানুষের পরমশত্রু। ক্রোধ দমন না কোরতে পারলে মানুষ হওয়া যায় না। পাগল বোলেছে তাতে কি হোয়েছে! আমাদের বাবা শ্মশানবাসী শিব পাগল। মা তারাও তো পাগলিনী। আমরা পাগল না হোলে মা-বাপের মান থাকে? এ দুনিয়াটাই যে পাগলের খেলা। পাগলের হাট-বাজার। এখানে যে আসে সেই পাগল হয়। ভগবানেরও তো অনেক নাম —কই, তিনি তো রাগ করেন না। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক ও অভিন্ন।

বামাচরণ মুড়ি চিবোয় আর ভাবে। ভাবনার শেষ নেই। সে যেন নিজের জীবনের দিকে তাকায়। সেখানে এ বামাচরণ তো নেই। আর এক বামাচরণ একা একা পথ বেয়ে চলেছে। ভয়-ডর নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই—কোন অমৃত লোকের সন্ধানে যেন তার যাত্রা চলেছে।…

বামাচরণ চোখ বোজে। তার বাহ্যজ্ঞান যেন নেই। আলোয় আলোময় হোয়ে গেছে তার হৃদয়-বৃন্দাবন। সারা দেহটা যেন এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে গেছে। বামাচরণ গোয়াল ঘরেই শুয়ে পড়ে।

॥ দশ ॥

দিন বয়ে চলে।

একদিন সকালে রাজকুমারীকে আড়ালে ডেকে হেমচন্দ্র বলেন : দিদি, বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আছে।

রাজকুমারী বলেন : আমাকে আবার বলার কি দরকার? তুমি এখন অভিভাবক, যা ভাল হয় তাই করো।

—তা বোললে হয়? তুমি দিদি, আমার চেয়ে কত বড়। এক কথায় গুরুজন। তোমার সংগে পরামর্শ না কোরে কোন কাজ করা কি ঠিক?

—বেশ বলো।

—খাজনা দেওয়ার সময় আসছে। এতদিন জামাইবাবুর সম্পত্তি তাঁর নামেই ছিল। এখন তোমার নামে পত্তন কোরতে গেলে অনেক খরচ তো কোরতেই হবে। তাছাড়া ঝামেলাও অনেক। বামাচরণ সাবালক হোলে তো কোন কথাই ছিল না। তাই বিনা ঝামেলায় অল্প খরচে কাজ সম্পন্ন কোরতে হবে।

হেমচন্দ্র ঢোক গিলে বলেন : তা খরচের জন্য তুমি ভেবো না। তোমার হেমচন্দ্র যখন এখনও বেঁচে আছে তখন তোমার বা আমার ভাগনে-ভাগনীর গায়ে একটা কাঁটার আচড়ও আমি লাগতে দেবো না। তুমি শুধু এই সাদা কাগজটায় একটা সই কোরে দাও।

একটু থেমে বোললেন : আজ জামাইবাবু বেঁচে থাকলে…… ।

হেমচন্দ্রের চোখ দুটো ছলছল কোরে উঠলো।

রাজকুমারী হেমচন্দ্রের এ নিখুঁত অভিনয় বুঝতে পেরেছেন। তিনি বোললেন : বেশতো হেমচন্দ্র, এর জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? সময় তো এখনও আছে। আমি বরং ওদের নিয়ে কালই আটলা চলে যাই। দু'চারদিন থেকে ঘর-দোরগুলো একটু দেখে

আসি। কতদিন বাড়ি ছাড়া, ঘর-দোরের কি অবস্থা হোল, একটু দেখে আসাই ভাল।

হেমচন্দ্র উল্লসিত হোয়ে বলেন : বেশ, তাই না হয় দু'চারদিন ঘুরে এসো। দেরী হোলে ভারী চিন্তায় পড়বো। বামাটার উপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে দিদি। ওকে না দেখতে পেলে মনটা যেন কেমন করে !

—আহা, তা তো হবেই—তোমারই তো ভাগ্‌নে।

গ্রামে ফিরে এলেন রাজকুমারী ছেলেমেয়ে নিয়ে। হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হোল। তিনি খাজনা মকুব করার এক করুণ আবেদন পাঠালেন নাটোরের রাণীর কাছে। আবেদন মঞ্জুর হোয়ে গেলো।

রাজকুমারী তারা মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। মা তারার কৃপা না হোলে কি এ কাজ সম্ভব হয় ? শুধু কৃপা কোরেই ক্ষান্ত হোলেন না। বামাচরণের একটা চাকরীও জুটে গেলো তারাপীঠে, মা তারার পূজোর জন্য নিত্য ফুল তুলবে।

বামাচরণ এই তো চেয়েছিল। তার তোলা ফুলে মায়ের পূজো হবে—এ যে তার পরম সৌভাগ্য।

বামাচরণ মনের আনন্দে ফুল তোলে আর গান গায়—

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ী খাস-তালুকে বাস করি।
নাই জরিপ জমাবন্দী। তালুক হয় না লাটে বন্দি মা,
আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হোয়েছেন কর্মচারী।
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয়দুর্গার নামে আঁটা আনন্দে করি মালগুজারী।
দ্বিজ রামপ্রসাদের আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারি।

জবাগাছের বনে ঢুকে বামাচরণ চমকে যায়। চারিদিকে জবা

ফুটে আছে। যেন মায়ের এক একটা চোখ জলছে জল জল কোরে গাছে! মা তারার রাঙাচরণ ছুটোর কথাই বার বার তার মনে পড়ে। অমনিধারা রক্তরাঙাই তো মায়ের চরণ ছুটি।...... ও চরণ ছুটি বুকে কোরে সে সারাজীবন না খেয়েও কাটাতে রাজী আছে।

বামাচরণ গাছতলায় জ্ঞানহারা হোয়ে পড়ে। পূজোর দেরী হোয়ে যাচ্ছে। তারাপীঠের পুরোহিত জবাবনে এসে দেখে যে বামাচরণ ফুলের সাজি হাতে মাটিতে পড়ে আছে। যার মাথার কোন ঠিক নেই, তাকে এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল রাখা চলে না। বামাচরণ কাজ হারালো। তার কি দোষ, মার যদি ইচ্ছা না হয় তো সে কি কোরবে? বামাচরণ বাড়ি ফিরে যায়। তাকে বাঁধবার ক্ষমতা কার আছে একজন ছাড়া, তাঁরই কাছে বাঁধা পড়তেই সে চায়। যে বাঁধনে সুখ আছে, শান্তি আছে, আছে এক পরম আত্মীয়তা, সেই বাঁধনেই তো বাঁধা পড়তে চায় সে।

সে বাঁধন একমাত্র তারা মা-ই দিতে পারেন।

সংসারের অভাব অনটন দেখে সে শংকিত হয়।

মনে মনে ভাবে—আচ্ছা, মা তারার তো অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাদের কি ছুটো খেতে দিতে পারেন না?

ভাইবোনের মুখের দিকে চেয়ে তার বড় কষ্ট হয়। সে মনের দুঃখে কোন কোনদিন বাড়ি ফেরে না। পড়ে থাকে কৈলাসপতি ব্রজবাসীর আশ্রয়ে!

তারাপীঠ ছেড়ে, এই মহাশ্মশান ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। তার মা-ভাই-বোন দুবেলা না হোক একবেলা খেয়ে বেঁচে থাকবে। বার বার বাড়ি গেলে শেষে সে আর ফিরতে পারবে না। জীব দিয়েছেন যিনি আহারও দেবেন তিনি। তার জন্য তার অত মাথা ব্যথা কিসের? তার চেয়ে এই বিস্তীর্ণ জংগলাকীর্ণ নরকংকাল

ছড়ানো, শিয়াল কুকুরবেষ্টিত মহাশ্মশানই তার কাছে পরম রমণীয়। কি পবিত্র যায়গা এই মহাশ্মশান—মানুষের শেষ আশ্রয়।

রাজকুমারী আজকাল বামার জন্য বড় চিন্তিত হোয়ে পড়েছেন। সে কখনও বাড়ি আসে, কখনও তিনচারদিন এলো না। কি খায়, কোথায় যায়, কি করে কেউই তার হদিস পায় না। যখন বাড়ি আসে, রাজকুমারী বোলে ওঠেন: হ্যাঁরে বামা! আমরা কি না খেয়ে মরবো—দিন যে আর চলে না। তুই ঘর-সংসার কোরবি না। আমি আর কতকাল তোদের আগলাবো? তোর সব বুঝেনে—

বামাচরণ কোন কথা বলে না, শুধু মিটিমিটি মায়ের দিকে চায় আর হাসে।

রাজকুমারী কাঁদেন!

বামাচরণ হাসে।

কি বিচিত্র পরিবেশ!

বামাচরণ বলে: আমার কি আছে যে আমি বুঝে নেবো মা! আমি তো সাথে কোরে কিছু আনি নি! আমি তো নিঃস্ব মা। এ নকল সম্পত্তি ভোগ করার ইচ্ছে আমার নেই মা। আসল সম্পত্তির সন্ধান দাও মা, আমি মনের অফিসে তা রেজিস্টারী কোরে ফেলি। আশীর্বাদ করো মা, সে সম্পত্তির দলিল যেন আমি অন্তরের সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখতে পারি।

রাজকুমারী অবাক হোয়ে বলেন: হ্যাঁরে, কি বোলছিস? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বামাচরণ বলে: মা! তুমি কিছু ভেবো না। মা তারা আছেন, কিছু ভেবো না মা। কিছু ভেবো না।

—তুই? চললি কোথায়?

—তারাপীঠে মায়ের মন্দিরে—

—আমাদের তুই দেখবিনে বামা ?

—আমি কে মা, কে আমি—সবই তুমি আর মা তারা।

—তুই কি ক্ষেপে গেলি বামা !

—তুমি আমায় আশীর্বাদ করো মা, আমি যেন ক্ষেপাই হোতে পারি।

ধীর পদবিক্ষেপে বামাচরণ বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাজকুমারী দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাঁর চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ কোরে জল পড়ে।

বামাচরণ তখন তারাপীঠের পথে—

রাজকুমারী চোখ বন্ধ করেন—

চারিদিকে শুধু অন্ধকার—কালিগোলা অন্ধকার।

॥ এগার ॥

বামাচরণ এখন সব সময়েই তারাপীঠের শ্মশানে পড়ে থাকেন। তাঁর জীবনের ধারা এখন ভিন্নপথে রূপ নিয়েছে। তাঁকে দেখলে এখন আর বোঝবার উপায় নেই যে তিনি কে! তাঁর ক্রিয়াকর্ম সবই বিচিত্র। কখনও তিনি দ্বারকা নদীতে স্নান কোরছেন তো কোরছেনই, কখনও তিন-চার ঘণ্টা জলের ভিতর ডুবে আছেন, কখনও হয়তো ভেসে রয়েছেন। ভিজে কাপড়েই শ্মশানে উঠে এলেন, এক পাল শিয়াল-কুকুর মায়ের ভোগ খাচ্ছে। বামাচরণও বসে গেলেন তাদের সংগে খেতে, কোন ঘৃণা নেই, কোন সংকোচ নেই, যেন বাড়ির ভাইবোন নিয়ে সেই এক পাতে মহানন্দে কাড়া-কাড়ি কোরে খাওয়া। কি অপরূপ এ দৃশ্য। জীবাত্মায় আর পরমাত্মায় এক হোয়ে গেছে, তা না হোলে কি করে এ সম্ভব!

কৈলাসপতি ব্রজবাসী সবই লক্ষ্য কোরেছেন। বামাচরণও তাঁকে আগলে রয়েছেন। কি এক নিগূঢ় রহস্য রয়েছে ব্রজবাসীর ভিতর তা বামাচরণ সব না বুঝলেও কিছু বুঝেছেন। কৈলাসপতি একটা আগ্নেয়গিরি। বামাচরণ তাতে বিস্ফোরণ ঘটাতে চান।

বামাচরণের তান্ত্রিক জীবনের পাঠ শুরু হয় কৈলাসপতির কাছে। কৈলাসপতিও তাঁকে তন্ত্রমন্ত্রের নিগূঢ় গোপন তত্ত্ব সরল ভাবে শিক্ষা দিতে থাকেন। জীবনের পাঠ শেষ কোরে বামাচরণ এবার হৃদয়ের গভীরে ডুব দিলেন! আত্মার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি পরমাত্মার সন্ধানে ব্যস্ত হোয়ে পড়লেন। প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান তাঁকে পেতেই হবে। দেখতে হবে কোন্ গভীরে সে রত্ন লুকিয়ে আছে।

কৈলাসপতির সংগ তিনি একটুও ছাড়েন না। দিনরাত তাঁর

পিছনে ছায়ার মত লেগে আছেন। সতেরো বছরের বামাচরণ যেন সত্তর বছরের মহাজ্ঞান তাপস হোয়ে গেছেন। কৈলাসপতি বাবার মানুষ চিনতে দেরী হয়নি—তিনি বুঝতে পেরেছেন এ আগুনের ফুলকি। একদিন না একদিন এ একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে। মানুষের মুক্তি কিসে হয়, চৈতন্য শক্তির জাগরণ কিসে হয়, মনের কলুষতা কিসে নষ্ট হবে, এসবের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁর এ দুনিয়ায় আসা। মা তারা তাঁকে তৈরী কোরে নিচ্ছেন উপযুক্ত কোরে—যেমন নিয়েছিলেন পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে।

সতেরো বছরের তরুণ বামাচরণ দুনিয়ার সকল ভয়কে জয় কোরে এই শ্মশানে পড়ে আছেন। কি ভয়াল ভীষণ এই শ্মশান! চারিদিকে বিরাট বিরাট গাছপালা অন্ধকারে এক একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। শিয়াল কুকুরের কাঁচা নরমাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি—কোথায় যেন একটা পেঁচা ডাকছে, নিস্তব্ধ নীরব নিথর। কোন সাড়া নেই—ডালপালা নড়লে যেন মনে হয় কোন মানুষ হিস্ হিস্ শব্দ কোরছে। অন্ধকারে পথ চলতে গেলে লতাগুল্মে পা জড়িয়ে ধরে। মড়ার খুলিগুলো আপন মনে চলে এসে যেন পথরোধ কোরে দাঁড়ায়।

কৈলাসপতি পাতায় ঘেরা পর্ণকুটিরে আসনে বসে আছেন। বাইরে বামাচরণ বসে আছেন। চারিদিকে তাঁর চোখ ঘুরছে, এ অন্ধকারের ভিতরও তিনি খুঁজছেন কি যেন! ‘জয় তারা’ ‘জয় তারা’ শব্দে বামাচরণ চীৎকার কোরে ওঠেন। সমস্ত শ্মশানে যেন তাঁর প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

কৈলাসপতি ভিতর থেকে বোলে ওঠেন : ভয় নেই, ভাল কোরে ডাক্—খোঁজ পাবি। হ্যাঁরে, তুই পাবিনা তো কে পাবে? মা যে তোর খোঁজেই বেরিয়েছেন মন্দির ছেড়ে।

বামাচরণ চমকে ওঠেন—একটা দেহ থেকে ছিন্ন মানুষের কাঁচা

হাত একটা শিয়ালে এনে তার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে। বামাচরণ হাত দিয়ে সেটা জংগলে ছুঁড়ে দিলেন। আপন মনেই তারে বললেন ঃ হ্যাঁরে, তোরা ওর সব খেয়েছিস, আহা! ওর চোখ দুটোও যদি রাখতিস্ তাহলে অন্ততঃ মা তারাকে দেখতে পারতো!

বামাচরণের ঘুম নেই, ক্ষিধে নেই, তৃষ্ণা নেই - তিনি যেন অনাদি কালের এক সতর্ক প্রহরী, কবে কত যুগ আগে তাঁর এক মহা সম্পদ চুরি হোয়ে গেছে—সে চোরের সন্ধান তিনি আজও পেলেন না। তাঁকে এমন ভাবে নিঃস্ব কোরে দিয়ে গেছে যে আজ তাকে ধরতে পারলে পা জড়িয়ে ধরে রাখতেন।

কিন্তু কোথায়? কোন্ অন্তরালে সে রয়েছে লুকিয়ে। বামাচরণ মনে মনে বলেন ঃ দেখা দে একবার, আমাকে খালি কোরে দিয়ে গেছিস, আমাকে পূর্ণ কর্। সারা দেহ যে আমার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। একটু আলো দে—আর যে পারিনে।

বামাচরণ বসে আছেন—তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে।

॥ বার ॥

তারাপীঠ তখন তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্রস্থল। মোক্ষদানন্দ কৌল পদে নিযুক্ত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হোতে আসেন পণ্ডিতের দল, তান্ত্রিক সাধকরা। শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

মোক্ষদানন্দ বলেন : ধর্মের গ্লানিতে আজ দেশের মাটি কলুষিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নেই, তাইতো একটা মহান জাতি পাপের পংকে ডুবে যাচ্ছে! সৎজীব যাপনে, সৎগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ, একনিষ্ঠ সাধনা, আত্মসংযম, একাগ্রতা—এসব না হোলে সাধন পথে একপা-ও এগোন যাবে না—সিদ্ধিলাভ কোরতে হোলে, অজানাকে জানতে হোলে এসব চাই। কেবল লোকদেখানো ধর্মের বুলি আওড়ালে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। ইচ্ছাশক্তিকে জাগাতে হোলে তপ-জপ-আরাধনা করতে হবে।

অদূরে মা তারার শিলামূর্তি। বামাচরণ বসে আছেন—একমনে মোক্ষদানন্দের কথা শুনছেন।

মোক্ষদানন্দ আবার বোলতে শুরু করেন : তারামায়ের কৃপাই হোল আসল বস্তু, তা পেতে হোলে সাধন-ভজন কোরতে হবে। সংসার আছে, পুত্র-কন্যা-স্ত্রী আছে তোমার, তুমি মায়াবদ্ধ জীব—তাতে কি? সাধন ভজনের তাতে বাধা তা নেই। তোমার সংসারের ভেতরই তো কর্মযোগ। কর্মযোগের সাথে সাথেই আসবে ভক্তিযোগ। মুক্তি পেতে হোলে চাই ভক্তি, তবেই তো মুক্তির সন্ধান মিলবে।

বামাচরণের চোখে-মুখে যেন এক অপূর্ব আলোর রোশনাই। তারা মার মৃন্ময়ী মূর্তির ভিতরে যেন চিন্ময়ী মূর্তি জেগে ওঠে। বামাচরণের চোখে-মুখে যেন বিদ্যুতের ঝলক! মা মা কোরে

তিনি মাটিতে আছড়ে পড়েন। উপস্থিত সবাই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে পড়ে। বামাচরণ আর যেন এ তুনিয়ায় নেই।

মোক্ষদানন্দ ধীরে ধীরে উঠে এসে তাঁকে স্পর্শ কোরে বোলে ওঠেন : বামাচরণ ওঠো, জাগো!

বামাচরণ কেঁদে লুটিয়ে পড়েন মোক্ষদানন্দের পায়ের ওপর। তুচোখ ভরে ওঠে জলে, বলেন : আমায় দয়া করুন। আমাকে পথের সন্ধান দিন।

মোক্ষদানন্দ তাঁকে তুলে ধরে দাঁড় করান।

বামাচরণ তেমনি ভাবেই কাঁদতে কাঁদতে বলেন : আমার কি গতি হবে? আমি কি এমনিধারা অন্ধকারেই পথ খুঁজে বেড়াবো। আপনি আমাকে দয়া করুন।

—এ অন্ধকার তোমার দূর হোয়ে যাবে—অন্তরলোকের দিকে চেয়ে দেখো সেখানে আলোয় আলোময় হোয়ে গেছে।

—কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—দেখবে বই কি! সময় এলেই ঠিক দেখতে পাবে। অধীর হয়ো না, বামা।

বামাচরণ কোন কথা বলেন না।

সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকেন মা তারার শিলামূর্তির দিকে।

আপন মনেই ঠোঁট তুটো তাঁর নড়ে ওঠে, গুনগুন কোরে গান ধরেন—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছো কি রাজমহিষী
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ তুরন্তকালের ফাঁসী।"

অনেক সাধকের লীলাভূমি এই তারাপীঠ তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য তীর্থের মত খ্যাতিলাভ করেনি। কারণ রাস্তাঘাট নেই।

যানবাহন নেই। মানুষ আসতোই না। চারিদিক শুধু বনজংগল। দিনের বেলায় ভয় করে। মহাশ্মশান ছিল আরও ভয়াবহ। সে সময়কার লোক মৃতদেহ নিয়ে এসে এখানে ফেলে দিয়ে চলে যেতো। আজ যেমন মৃতদেহ সৎকারের জন্য মানুষ অনেক খরচ করে, তখনকার মানুষের এত খরচের বালাই ছিল না। দেশে তখন পয়সা ছিল না। তাই অনেকে আবার মৃতদেহ বালির তলায় পুঁতে রেখে যেতো—এখনও সে নিয়ম আছে।

ভজন সাধনের জন্য যে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন হোত, যে নিবিড়তা একাগ্রতা না হোলে সাধন ভজনে ব্যাঘাত ঘটতো তেমনি যায়গা ছিল এই তারাপীঠ। তৎকালীন সাধকরা তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন নিরিবিলি যায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন।

যুগ পরিবর্তনে কত দেশের চেহারা বদলে গেছে। কত নদীর দুধার দিয়ে গড়ে উঠেছে উপনিবেশ। সৃষ্টি হোয়েছে কত শিল্প, কিন্তু তারাপীঠ ঠিক একই যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই নদী আজও তেমনি ভাবে উদ্দাম স্রোতে গা ভাসিয়ে বয়ে চলেছে মহাশ্মশানের কোল দিয়ে—শ্মশানে লতাগুল্ম গাছপালা দিন দিন আরও ঘন থেকে ঘনতর হোচ্ছে। বড় বড় গাছের মাথার যেন আকাশ ছোঁয়ার বাসনা। সবার ওপরে জেগে আছেন মা তারা—যাঁর পায়ে এসে মাথা ঠেকিয়েছে দেশ বিদেশের তন্ত্রসাধক। সাধন পথের যে যেদিকে যাক। যতদূরই যাক, তাঁকে তারাপীঠের মহাশ্মশানে আসতে হোয়েছে।

॥ তের ॥

বীরভূমের একচ্ছত্র অধিপতি তখন আশাহুল্লা। রাণী ভবানী নাটোরের রাণী। রাণী ভবানী চিন্তিতা হোয়ে পড়লেন। বিধর্মী আশাহুল্লা দেবমন্দির, পূজার্চনা এসব পছন্দ কোরতেন না। সবসময় যেন একটা বিরূপ ভাবই পোষণ কোরতেন। বীরভূমের সর্বেসর্বা সে, আর তারই রাজ্যে হবে পুতুল পূজা! আশাহুল্লা মনে মনে মতলবই বোধ হয় আঁটতে থাকেন।

ধর্মপরায়ণা রাণী ভবানী মনে মনে বুঝতে পারেন। তাই তিনি নিজ রাজ্যের কিছুটা আশাহুল্লার সঙ্গে বিনিময় কোরে তারাপুরকে নিজ মৌজার ভিতরে আনেন।

মা তারার কৃপায় এ কাজ কোরতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তারাপুরকে সম্পূর্ণভাবে নিজ আয়ত্বে আনার পর তিনি তারামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও নিত্যভোগ ও পূজার ব্যবস্থা করেন।

রাণী ভবানী সেদিন তারাপুরকে ঐ ভাবে রক্ষা না কোরলে আজ ইতিহাস থেকে তারাপীঠের নাম বোধ হয় চিরতরে মুছে যেতো। তন্ত্রসাধনার বিরাট এক কর্মক্ষেত্র বিধর্মী আশাহুল্লার রোষবহ্নি থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই আজ তারাপীঠ এক মহাতীর্থ রূপে দেশের মানুষের কাছে পরিগণিত হোয়েছে।

মা তারার চরণ স্পর্শে তাই আজ তারাপুর ধন্য—তাই আজ পেয়েছি বামাচরণকে। যিনি সব কিছু ছেড়ে মায়ের কৃপা লাভ কোরবার জন্য তারাপীঠের মহাশ্মশানে দিনরাত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন মা তারার! মহাশ্মশানের বক্ষদেশ তাই আজ শিবাদলের চরণধ্বনিতে প্রকম্পিত।

এরই মাঝে বামাচরণ হোয়েছেন অতন্দ্র প্রহরী।

তারাপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে রামাৎ গ্রাম। এই গ্রামেই মোক্ষদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে বিয়ে কোরে তিনি নানান রকম কুসংসর্গে পড়েন। তার ভয়ে গ্রামের মেয়েছেলে বের হোতে পারতো না। চরিত্র ভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ তিনি বাপ মার কাছে দিন রাত লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেতেন—শেষে মনের দুঃখে তিনি একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। মোক্ষদানন্দ ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন ও সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁর ভাল জানা ছিল। তীর্থে তীর্থে তিনি পাগলের মত ঘুরে বেড়ান, কোন সহায় নেই সম্বল নেই—কোথায় যাবেন তাও জানেন না। কি যে তিনি চান তাও জানেন না। তাঁর যেন কারও কাছে কিছুই চাওয়ার নেই।

কিন্তু ভগবান যাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ কোরছেন তিনি পালাবেন কোথায়? পাহাড়ে, পর্বতে, গিরিকন্দরে, জলেস্থলে, অন্তরীক্ষে যেখানেই যান না কেন ভগবান তাঁকে চাইলে তাঁর কোন যায়গায় লুকিয়ে থাকার উপায় নেই।

তাই মোক্ষদানন্দকে অলক্ষ্যে কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাড়িয়ে নিয়ে তারাপুরে এনে ফেললো। মোক্ষদানন্দ তারাপুরে এসে আনন্দনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরে সাধন ভজন কোরতে থাকেন ও তারাপীঠেই সিদ্ধিলাভ করেন।

মায়ের কৃপা যার ওপর থাকে শত কলংকের দাগ থাকলেও তা মুছে যায়। হাজার পাপে ভরা দেহও মায়ের কৃপা দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ শুদ্ধ দেহ হোয়ে যায়।

ছোটবেলায় যে ছিল বয়াটে মানিক রাম, সবাই যাকে মান্‌কে বোলে ডাকতো, সবাই যাকে বদ বোলে দূরে সরিয়ে রাখতো, আজ সে সিদ্ধপুরুষ মোক্ষদানন্দ।

"এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি যাদু
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয় তস্করও হয় সাধু"

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মোক্ষদানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠলো মানুষের জন্য। মানুষ কত নীচে নেমে গেছে—ধর্মের পথ ছেড়ে দিয়ে পেছনে চলেছে তাই তো মানুষ এত দুঃখ ভোগ কোরছে। তাদের পথের গতি পরিবর্তন কোরতে হবে। মানুষের সমাজে যে সমস্ত নীতির শাসন আছে তাকে কুসংস্কারমুক্ত কোরতে হবে। তিনি মনুর ভাষ্যকে সহজ বোধগম্য কো!রে নতুন ভাবে মানুষের মাঝে প্রচার কোরলেন। দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যে মোক্ষদানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

তারাপীঠ তখন তন্ত্রসাধনার মধ্যমণি। সর্বদাই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীতে তারাপীঠ জমাট। কিন্তু মানুষের যেন শংকা যায় না। তান্ত্রিক সাধুরা বুঝি সব পারে—জ্যান্ত মানুষকেও বোধ হয় মন্ত্রবলে আস্ত গিলে ফেলতে পারে। সাধারণ মানুষ তন্ত্রসাধনাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারতো না। তারাপীঠের নাম শুনলে সবার প্রাণ আঁতকে উঠতো।

তন্ত্রশাস্ত্রের মূলকথা দেবাদিদেব মহাদেব মহামায়ার কাছে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তন্ত্রশাস্ত্র উচ্চমার্গের সাধনার দ্বারা করায়ত্ব কোরতে হয়। তারাপীঠের সাধকরা পঞ্চমকার সাধনার ওপরই আধিপত্য দিতেন। মহাশ্মশানে যে সব ভৈরবরা থাকতেন তাদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন কোরতে হোত। নগ্ননারীর বুকের ওপর বসে সাধন ভজন কোরতে হোত। কি ভয়াল ভয়াবহ সাধনা!

মোক্ষদানন্দ নতুন পথ দেখালেন। সাধনার জন্য উপকরণ কি প্রয়োজন? একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠ ভাবে ইষ্টদেবীর সাধনা কোরলেই সিদ্ধিলাভ হবে। ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য কোন সেতু তৈয়ারী কোরতে হবে না। কোন সুরম্য প্রাসাদও লাগবে না। পথ একটাই—সে পথ তিতিক্ষার পথ। সেই পথ হৃদয়েই বিদ্যমান। হৃদয়ের বাইরে তাঁকে খুঁজতে হবে না। এর মাঝেই তিনি লুকিয়ে আছেন। তাঁকে জাগাতে হবে—তাঁকে জাগানোই তো মানুষের প্রথম ও শেষ

কাজ। এতেই তাঁকে পাওয়া হবে। মুক্তি হবে, ঋদ্ধি হবে, সিদ্ধি হবে।

মহাশ্মশানের মাঝে গভীর জংগলের ভিতরই মোক্ষদানন্দের আসন। পাতায় ঘেরা কুটির। মাটির বারান্দা—সব সময় একটা ধুনী জ্বলছে। ভৈরবের দল চারপাশে তাঁকে ঘিরে আছে। বামাচরণও এক পাশে বসে আছেন। বুঝুন না বুঝুন মোক্ষদানন্দের কথাগুলো যেন তিনি চুপি চুপি গলাধঃকরণ কোরছেন।

মোক্ষদানন্দ সুরাপাত্র থেকে খানিকটা ঢেলে খেয়ে নিয়ে বোললেন: কলির জীব অল্পায়ু—দিনরাত খাওয়া পরা নিয়ে কেটে যায়। জন্ম থেকেই তাদের অন্নচিন্তা। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্তও তাদের সেই একই চিন্তা। পুত্র কন্যা নাতী নাতনী এইসব খেলার পুতুল সাজাতে সাজাতেই তাদের জীবন প্রদীপের তেল যে কখন ফুরিয়ে আসে তা টেরও পায় না। সাধন ভজন কোরবার সময় তাদের আর মেলে না। কখন যে এ দুনিয়ায় তারা এসেছিল আর কখন যে তাদের সময় ফুরিয়ে গেলো, এ হিসাব তারা কোরতে পারে না। হিসাব গরমিল হোয়ে যায়। এর মধ্যে যারা চালাক চতুর তারা হয় তো এর মধ্যেই কিছু কিছু সাধনা করে। তারা মায়ের কৃপা তাড়াতাড়ি পায়। কারণ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থেকে মায়ার শিকলে বাঁধা পড়েও যে তারা সাধন-ভজনের সময় পায়, সে তো বড় কম কথা নয়।

একটু থেমে আবার তিনি সুরু কোরলেন: শক্তি সাধনার পথ দুটো। একটা প্রবৃত্তি আর একটা নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি হোচ্ছে ভোগ, আর নিবৃত্তি হোচ্ছে যোগ। নিবৃত্তি নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে যারা তারা জন্ম-জন্মান্তর হোতে ভোগ বাসনা চরিতার্থ কোরে এসেছে। কর্ম ও ভোগ শেষ না হোলে নিবৃত্তি আসে না। সাধন ভজন ছাড়া কলির জীবের উদ্ধারের আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। যতই

আকাশে হাওয়াই জাহাজ ওড়াও আর জলে জাহাজ ভাসাও—এ ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই। সাধন কোরতে কোরতে পরমব্রহ্মের সংগে মিশে যেতে পারলেই বিশ্বজননীর কোলে তুমি আশ্রয় পেলে। তারা মা আমার সর্বভূতেই আছেন। যে ব্রহ্ম সেই শক্তি, এক অভিন্ন।

মোক্ষদানন্দ খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে থাকলেন। সবাই তাঁর দিকে চেয়ে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

তিনি চোখ খুললেন: আত্মশুদ্ধিই হোচ্ছে সাধন মার্গের প্রথম সোপান। মানুষের মনটা হোচ্ছে এই বনের মত—চেয়ে দেখছো কত আগাছা কত নোংরা, এগুলো পরিষ্কার কোরে তবে ঘর বানানো যায়। বসতি হয়। তেমনি আমাদের এই মনটা। ওরে এখানেও যে বড় ময়লা। বড় আগাছা—এগুলো আগে কাটতে হবে। মনের ময়লা পরিষ্কার কোরতে হবে, তবেই তো মায়ের জন্য ঘর তৈরী হবে। তবেই মা এসে বসত কোরবেন। মনের সংস্কার আগে চাই। মা তারার আমার হাজার রূপ। ষষ্ঠ রিপুকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারলে, মনটা মা মা হবে। তখন আর ভাবনা কি—যা দেখা যাবে সবই তারা মা। মা মা জগত না হোলে, সাধন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লোক দেখানো পূজা অর্চনা, উৎসব কোরলে মনকে ফাঁকি দেওয়াই সার হবে। অনুভব আগে, তারপর অনুরাগ—অনুভব না কোরতে পারলে অনুরাগ আসবে না।

ওরে, গেরুয়া পরে কি হবে, মনই যদি গেরুয়া রঙে না রাঙালো তাহলে ও সাধুগিরির মাঝেই মস্ত ফাঁকি থেকে যায়!……

বামাচরণ চুপ কোরে বসে আছেন। তবে চোখে জলের ধারা। যেন মোক্ষদানন্দের কথাগুলো তাঁর অন্তরে গিয়ে বর্ষণ শুরু কোরেছে।

মোক্ষদানন্দ বামাকে ডেকে বোললেন: আজ কতদিন হোল

তুই বাড়ি যাসনি, একবার মার সংগে দেখা কোরে আয়। ওরে, মাকে কষ্ট দিয়ে কোন সাধন-ভজন হয় না। গর্ভধারিণী মার মনে ব্যথা দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ মা-তারার কোল পায়নি। মাতৃভক্তি যার আছে তার সিদ্ধিলাভে দেরী হয়নি, কারণ ঐ ভক্তির মাঝখান দিয়েই তো তার রাস্তা অনেক কমে যায়।

বামাচরণ প্রণাম কোরে হাত জোড় কোরে বলেন ঃ

গুরুব্রহ্মা, গুরুবিষ্ণু, গুরুদেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

মোক্ষদানন্দ তার মাথায় হাত দিয়ে বলে ওঠেন ঃ যা ঘুরে আয়। আমি আর ক'দিন রে। তোকে সব বুঝে পড়ে নিতে হবে তো।

বামাচরণ চলে যান।

॥ চৌদ্দ ॥

সন্ধ্যা হয় হয়। বোধহয় পুর্ণিমার রাত। চারিদিকে জ্যোৎস্নার মেলা। নীলাকাশে নক্ষত্রগুলো বড় বড় চোখ মেলে তাকাচ্ছে। পথের পাশে বনঝোপগুলো যেন কি এক অজানা সাধনায় মগ্ন। নীড়ের পাখী বাসায় বসে বুঝি পরম চিন্তায় ডুবে আছে।

বামাচরণ বাড়ি ঢুকলেন। মা তখন তুলসীতলায় ঠাকুর প্রণাম কোরছেন।

—মা!

—কেরে বামা এলি? কোথায় ছিলি এতদিন? আমাকে পাগল করাই যদি তোর ইচ্ছে থাকে তাহলে আগে আমাকে দ্বারকার জলে ভাসিয়ে দে। তারপর তোর যা ইচ্ছে তাই কোরে বেড়াস।

বামাচরণ কোন জবাব দেন না।

রাজকুমারী তার গলায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন আর বলেন: হ্যাঁরে, তোর চেহারাটা কেমন হোয়েছে, এতদিন কি কিছু খাসনি?

—মা, তারা মায়ের রাজত্বে কেউ কি না খেয়ে থাকে?

রাজকুমারী একটু চুপ কোরে থেকে বলেন: বামা, মার কি ব্যথা তুই কি তা জানিস?

—হ্যাঁ মা, কিছু কিছু জানি—

—কেমন কোরে জানলি?

—কতদিন ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট কোরেছি। মায়ের মন না কাঁদলে আমার মুখের সামনে খাবার আসতো কোথা থেকে? আমার ক্ষিধের জ্বালা দেখে মা তারা-ও আমাকে খেতে দিতেন। তাইতো বুঝতে পারি মা, মা হওয়ার কি জ্বালা!

—তা যদি বুঝে থাকিস তাহলে আমাকে ব্যথা দিস কেন?

বামাচরণ চুপ করেন। কোন কথা তাঁর মুখে যেন আসছে না।

—কিরে কথা বোলছিস না যে ?

—মা, তোমাকে ব্যথা দেবো এমন শক্তি আমার নেই। মা তারার কাছেই জানাও, তিনিই জবাব দেবেন।

—আমি আর কতকাল রে, তোর সব বুঝে পড়ে নে, আমাকে মুক্তি দে।

বামাচরণের মনের মধ্যে ঢেউ খেলে যায়—মুক্তি, মুক্তি, মায়া মুক্তি! পৃথিবীতে সবাই মুক্তি চায়।

তারাপীঠে গুরুদেব বোললেন—সব বুঝে-পড়ে নেওয়ার জন্য। মা-ও বোলছেন—মুক্তি চাই।

আর আমি কি কোরব, আমি কি চাই, মা তারা বলে দে—বেটি, আমি কি চাই। আমার যে সব খালি, এত বেশী চাই আমার যা না হোলে হৃদয় পরিপূর্ণ হবে না! আমার শূন্য তুই পূর্ণ কর্ মা।

বামাচরণ কাঁদছেন। রাজকুমারী অন্য কাজে গেছেন। ভাই রামচন্দ্র গেছে জমিদারবাড়ি মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতি কোরবার জন্য।

রাজকুমারী এসে বোললেন : চল্ খেয়ে নে—

বামাচরণ মায়ের অলক্ষ্যে চোখদুটো মুছে বলেন : রাম আসুক, দুইজন একসাথে খাবো।

পরে বামাচরণ একটু হেসে বলেন : ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন, আর কলিযুগে রামচন্দ্র মায়ের সেবা কোরছে। রামচন্দ্রের মত ভাগ্যবান আর কে আছে। রামচন্দ্র থাকতে তোমার কি ভাবনা মা। তোমার বামা লক্ষ্মণ সেজে একালে যদি মাতৃসত্য পালন কোরবার জন্য বনে যায় তাতে তোমার ব্যথা কেন ?

রাজকুমারী অবাক হোয়ে বলেন : মাতৃসত্য আবার কিরে বামা ?

—হ্যাঁ মা, মাতৃসত্য, ঠিকই বোলছি। তারাপীঠের মা তারা

সেও তো আমার মা। তুমি আমার ছোট মা, আর মা তারা আমার বড় মা।

রাজকুমারী কথা বলেন না। মনের গোপন কোণে একটা অজানা আশংকা যেন উঁকি মারে।

বামাচরণ মুখ নীচু কোরে বলেনঃ মা, বড় মা যে আমায় দিনরাত ডাকছেন, আমি কথা দিয়েছি, যাবো ?

—বেশ তো যাস ! কিন্তু মাতৃসত্যটা কি রে বামা ?

—ওটা আমি বোঝাতে পারবো না।

রাজকুমারী রান্নাঘরের দিকে যান।

বামাচরণ বাইরে এসে অশ্বত্থ তলায় বাঁধানো মণ্ডপটার উপর বসে। মা তারা যেন জ্যোছনা হোয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন।

বামার মন চলে যায় তারাপীঠে।

মোক্ষদানন্দ বোলেছেন তাকে সব বুঝে-পড়ে নিতে হবে। নিজের হিসাবের খাতায় যে জমা-খরচ কোরতে পারলো না, সে নেবে অন্যের জিনিস বুঝে-পড়ে।

বামাচরণ গান ধরেন—

"মনরে আমার ভোলা মামা, ও তুই জানিস্ নারে
খরচ জমা।
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি—
ওরে, জমা খরচ ঠিক করিয়ে বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা।
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল ফাঁকি
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কিসের খরচ কিসের জমা
ওরে, অন্তরেতে ভাব বসি, কালী, তারা, উমা, শ্যামা।"

বামাচরণকে ঘিরে রাজকুমারীর স্বপ্নের শেষ নেই। ছেলে বড়

হোয়ে সংসারের হাল ধরবে, তাঁদের দুঃখ ঘুচবে। তারপর একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বামার বিয়ে দেবেন।

ক্ষেপা ছেলেকে তিনি চোখের আড়াল হোতে দেন না! বামাচরণ সদা অন্যমনস্ক, তাঁর যেন কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। তাঁর মনে সব সময় একই কথা বারবার ঘুরে মরছে—মায়া ত্যাগ না কোরতে পারলে সবই ব্যর্থ হবে।

বামাচরণ চমকে ওঠেন: মায়া, মায়া, মায়া। এ ত্যাগ কোরতেই হবে। তার উদাসী চঞ্চল মন কান পেতে শোনে—কে যেন তাঁকে ডাকছে, ওরে আসবি বোলে চলে গিয়েছিস। ফিরছিস নে কেন?

ক্ষেপা ছেলের হাবভাব রাজকুমারীর ভাল লাগে না। মনের ভিতর কে যেন অনবরতঃ বোলছে রাজকুমারীকে: ওরে! ও তোর নয়, ওকে ছেড়ে দে!…

রাজকুমারী আপন মনে বোলে ওঠেন: কি, ও আমার নয়? আমি কি ওকে দশমাস দশদিন পেটে ধরিনি? অসুখ-বিসুখে বিনিদ্র রজনী কি কাটাইনি? তবে—

বামাচরণ বোলে ওঠেন: কি বোলছ মা?

—কি আবার বোললাম?

—বারে—এই যে আমি শুনলাম।

—তুই পাগল কিনা!

বামাচরণ হাসেন।

রাত গভীর হয়। আটলা গ্রাম যেন ঘুমে ঢুলে পড়েছে। শুধু মাঝে মাঝে দুচারটে শিয়াল-কুকুরের ডাক শোনা যায়। বামাচরণ ঘুমোতে পারেন কই! কি এক অস্বস্তি তাঁকে যেন ক্রমাগত দংশন কোরছে। বারে বারে তাঁর মনে হোচ্ছে—কে যেন তাঁর দোরে এসে করাঘাত কোরছে। এ তো দোরে করাঘাত নয়।

এ যে অন্তরের দ্বারে করাঘাত।

ঘুমোবেন কি কোরে তিনি।

একটু কোরে তন্দ্রা আসে আর অমনি কে যেন মনের মধ্যে এসে তাঁর টোকা মারে।

বামাচরণ বাইরে আসেন। রাত কত কে জানে। অশ্বত্থ গাছটার তলায় পাতা ঝরার শব্দ হোচ্ছে। দূরের বনঝোপে এক ঝাঁক জোনাকীর মেলা বসেছে। বামাচরণ অশ্বত্থ তলার নীচে বাঁধানো যায়গাটায় বসলেন। সামনে পিছনে অন্ধকার। একটা বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

বামাচরণ গান ধরেন।

দুঃখের কথা শোন্ মা তারা

আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।

যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এমনি কাজের ধারা॥

—বামাচরণ ঘরে আয়!

—ঘরই যে আমায় বার বার সরিয়ে দিচ্ছে।

—এসব কি বোলছিস বাবা?

রাজকুমারীর চোখে জল।

বামাচরণ বোলে ওঠেন: মা, বাবা তো মা তারার ওপরই আমাদের ভার দিয়ে গেছেন।

—তাতো জানি। কিন্তু তবুও তো নিশ্চিন্ত হোতে পারছিনা।

—মা, আমি তোমার ছেলে হোয়েও কোন কাজে লাগতে পারলাম না। আমাকে আবর্জনা মনে কোরে বিদেয় কোরে দাও মা।

রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বামার মুখ চেপে ধরেন: বালাই ষাট্, ও কথা বলিস নে। আমার বুকটা যে ফেটে যায়।

—মা, পণ্ডিতমশায় তো আমায় একদিন ছুটি দিয়েছেন, আজ তুমিও আমাকে ছুটি দাও মা!

রাজকুমারী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন—ছুটি চাস বামা!

রাজকুমারী আর কিছু বোলতে পারেন না। চোখের জলে তাঁর সারা দেহ-মন ভেসে যায়।

বামাচরণ প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়ান।

—মা, মা তারা সবার মুখেই অন্ন যোগাবেন! আমি পথ পেয়েছি মা। আমাকে তুমি এগিয়ে দাও মা, আমি বাকী পথ চলে যাই।

রাজকুমারী প্রদীপের আলোটা খোলা দোরের সামনে এসে ধরেন—অতটুকু আলোতে যেন চারিদিক আলো হোয়ে গেলো। বামাচরণ পথ বেয়ে চলে যান।

মুক্তি পেয়েছে বামাচরণ। মায়ার পিঞ্জর থেকে তিনি ছাড়া পেয়েছেন।

তখনও ভোর হয়নি।

বামাচরণ হন হন কোরে হেঁটে চলে এলেন দ্বারকা নদীর ধারে। তারপর সোজা তারাপীঠের মহাশ্মশানে।

আর ভয় নেই। আর ভাবনা নেই। মায়ার বাঁধন নেই। এবার তিনি তারাপীঠের একতারাতেই জীবনের সুর বাঁধবেন।

মহাশ্মশানের ভিতর পর্ণ কুটিরে কৈলাসপতি যেন তাঁর প্রতীক্ষাতেই আছেন। বামাচরণ গিয়ে প্রণাম কোরে বোললেন: মায়ের অনুমতি পেয়ে গেছি, এবার আমায় দয়া করুন।

কৈলাসপতি তাঁকে নির্দেশ কোরলেন কুটিরের ভিতর যেতে।

চারিদিকে নিকষকালো অন্ধকার। বামাচরণ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন ঘরময় আলো হোয়ে গেছে। এত আলো কোথা থেকে এলো। এই অন্ধকার রাতে কোটি চন্দ্রের আলো কে প্রকাশ কোরল?

বামাচরণের সামনে প্রকট হোয়ে দেখা দেয় মা তারার দশ মহাবিদ্যার অপরূপ রূপ।

বামাচরণ দুচোখ মেলে চেয়ে দেখে চোখ ঢেকে চীৎকার কোরে ওঠেন : চোখ ঝলসে গেলো। আমি যে অন্ধ হোয়ে গেলাম! মা, মা, দেখতে দে, প্রাণ ভরে তোর ঐ ভুবন ভোলানো রূপ। আমি মন্ত্র জানিনে, তন্ত্র জানিনে আমাকে তুই বিমুখ করিসনে মা!

বামাচরণ অজ্ঞান হোয়ে কুটিরের ভিতর পড়ে যান। অন্তর বাহির তাঁর আলোয় আলোময় হোয়ে গিয়েছে। ভিতরের সমস্ত দরজা তাঁর এক নিমিষেই যেন খুলে গেছে। তার দেহের দেউল আজ যেন আলোকমালায় সজ্জিত।

কৈলাসপতি বাবার কণ্ঠ শোনা যায়—

যা দেবী সর্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥

॥ পনের ॥

১২৭৪ সালের এক মহানিশায় শুভলগ্নে কৈলাসপতি বামাচরণকে বসিয়ে দিলেন মহাশ্মশানের শিমূল তলায় বশিষ্ঠের আসনে। এই আসনে বসে সাধন-ভজন করা সকলের সাধ্যাতীত। বামাচরণকে মা তারা চরমভাবে ক্ষেপিয়েছিলেন বলেই আজ 'বামাক্ষেপা' হোয়ে সেই আসনে বসতে পারলেন।

কৈলাসপতি বীজমন্ত্র দিলেন বামাচরণের কানে। ধ্যানময় হোল বামাচরণের মন। নিখিল বিশ্ব তাঁর চোখের সামনে প্রকাশ হোয়ে যায়। এ কোন্ জগৎ—সর্বত্রই যে মা তারা। তারাময় জগৎ বামাময় হোয়ে যায়। এখানে আমি বোলে কেউ নেই, সবই তুমি। আমি ও তুমি, তোমাতেও আমি। আমার আমিত্ব এখানে ভস্ম হোয়ে গেছে।

সাধন-পথে বামাচরণ সিদ্ধিলাভ কোরলেন। সাধক বামাচরণ রূপান্তরিত হোলেন পরম সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা রূপে।

মোক্ষদানন্দ একদিন বামাক্ষেপাকে বোললেন : একদিন তোমাকে বোলেছিলাম যে এখানকার সবকিছুর ভার তোমায় নিতে হবে, সে কথা তোমার মনে আছে?

বামাক্ষেপা বোললেন : হ্যাঁ, মনে আছে।

—তাহলে এবার তুমি ভার নাও তারাপীঠের।

—আমি!

—হ্যাঁ তুমি! এবার থেকে তারাপীঠের তুমিই হবে প্রধান।

—আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবেন?

—কাশী যাবো—বয়সের ভার আর সইতে পারছিনা ; তাই ঠিক কোরেছি জীবনের শেষ কটা দিন কাশীতেই কাটাবো।

কৈলাসপতি ব্রজবাসীও তাঁর সংগী হোলেন।

বামাক্ষেপা বোললেন : তাহলে আমিই বা পড়ে থাকি কেন? অন্নপূর্ণার রাজ্যটা একবার দেখেই আসি।

মোক্ষদানন্দ জবাব দিলেন : তা কি কোরে হয়! মা তারার সেবা কে কোরবে?

—আমি অনুমতি নিয়ে যাবো! আপনারা আমায় সংগে নিন। বড় ইচ্ছে একবার অন্নপূর্ণা দর্শন কোরে আসি।

অগত্যা ওঁদের রাজী হোতে হোল।

মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসনের পাশে বামাক্ষেপা বসে আছেন। পাশে জগডুমুর গাছটার লতা বেয়ে একটা কাঠবিড়ালী উঠছে আর নামছে। বামা বোললেন : এই পালাসনে যেন। আমি চট কোরে কাশী থেকে চলে আসবো।

সকাল হোয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবুও মনে হয় আঁধারের আভরণ সরে যায়নি এ মহাশ্মশান থেকে। চারিদিকে ঘন জংগল—বড় বড় গাছপালাগুলো যেন সূর্যের আলো প্রবেশ কোরতে দেয়না। গাঢ়রাতে বোধহয় ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হোয়েছিল, তারই জল টপ্ টপ্ কোরে পাতা বেয়ে পড়ছে।

বামা 'জয় তারা' বোলে একবার হুংকার ছেড়ে কাদের যেন ডাক দিলেন : ওরে কালু-ভুলু, জামভোলা, সাবান দিদি, থরহরি, দুর্গা।

ক্ষেপার ডাক শুনে একপাল কুকুর বনজংগল ভেঙে ছুটে এলো। বামা সবার দিকে চেয়ে বোললেন : হ্যাঁরে! শ্বেতফুলি কই, হরহরি কই, আমার বুড়িমা সেই বা কই—পদি, মরমরি, সবাই আসবি তো!

আবার ডাকলেন : ও হরির মা, তাড়াতাড়ি আয়, সব ফুরিয়ে গেলো, বামাক্ষেপা আপন মনে হেসে ওঠেন : ভারী মজা দুনিয়াখানা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবিনা। মা তারা মস্ত এক দোকান খুলেছে নীলামের। যার যা আছে সব জমা দে, জীবনভোর যা সঞ্চয় কোরেছিস সব রাখ্ এখানে। ভাগ্য ভাল হোলে দামী জিনিস পেয়ে যাবি।

অদূরে কুটিরের ভিতর থেকে একটা স্বর ভেসে আসে গুরুগম্ভীর ভাবে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"।

[৯ম।২২ গীতা]

সমস্ত বনময় যেন তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

একপাল কুকুর এসে ভীড় কোরেছে বামাক্ষেপার পাশে। এরা যেন তার কতকালের পরিচিত, কত আপনার, কত কাছের মানুষ।

বামাক্ষেপা মা তারার ভোগ নিয়ে আসেন বড় একখানা কলাপাতায় কোরে। সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

—দাঁড়া, দাঁড়া, আমায় একটু বসতে দে।

বামাক্ষেপাও তাদের সংগে এক পাতেই খেতে আরম্ভ করেন। কখনও কুকুরের মুখে কিছুটা দিয়ে বাকীটা তার মুখ থেকে নিজেই মুখে দিচ্ছেন। কোন বিকার নেই, কোন ঘৃণা নেই, কোন সংকোচ নেই।

জীবাত্মা পরমাত্মা সব একাকার হোয়ে গেছে। জীবের মধ্যে শিবদানি হোলেই সিদ্ধিলাভ—এই তো কলির সাধনা। জীবসেবা মানেই তো মা তারার সেবা। কলিতে মা তারাকে লাভ কোরতে হোলে বেদ-পুরাণ, তন্ত্র-মন্ত্র, জপ-তপ কোন কিছুরই প্রয়োজন হয়না। এক মনে, এক ভাবে জীবসেবা কোরলেই তার মুক্তি হোয়ে যায়। সর্বভূতে মা যে বিরাজমান।

অদূরে একটা রুগ্ন কুকুর চেয়ে আছে বামাক্ষেপার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে। বামা খানিকটা প্রসাদ মুখে দিতে গিয়ে আর খেতে পারলেন না। হঠাৎ ডাক দিলেন কুকুরটাকে: হরির মা, এদিকে আয়।

কুকুরটি তার রুগ্ন দেহ নিয়ে কোনমতে বামাক্ষেপার সামনে

এসে বসলো। এরা যেন বামার ভাষা বোঝে। তাঁকে এরা ভাল ভাবেই জানে।

বামা তার মুখে খানিকটা প্রসাদ পুরে দিয়ে বোললেন: তুই হচ্ছিস হরির মা, আর তুই যদি অভুক্ত থাকিস, তাহলে তোর ছেলে আমাকে যে শেষের দিনে পার কোরবে না।

হরির মা আনন্দে বামার হাত চাটতে থাকে—হরির মা, এ জীবনটা মস্ত একটা কলার পাতা, যতক্ষণ খাবার সাজানো থাকবে প্রাণভরে খেয়ে নিবি। খাওয়া শেষ হলে তো পাতাটা ফেলে দেবে—তেমনি তোর দেহটাও ফেলে দেবে।

বামাক্ষেপা 'জয় তারা' বোলে চীৎকার করে ওঠেন।

কুকুরগুলো সব সরে যায়।

—ওরে শোন, আমি কাশী যাবো, তোরা গোলমাল করিসনে, আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

বামাক্ষেপা হো হো কোরে হেসে ওঠেন। আবার পরক্ষণেই মুখখানা গম্ভীর হোয়ে যায়।

বামার কণ্ঠে সুরের মুর্চ্ছনা জাগে—

"গয়া গংগা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চি কেবা চায়,
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়,
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়
সন্ধ্যা তারে সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধে নাহি পায়।"

॥ ষোল ॥

মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব—তীর্থ বারাণসী। তারই কোল দিয়ে ভবতারিণী গংগার মন্দাকিনী ধারা। শাস্ত্র বেদ পুরাণের হীরকখনি বারাণসী। জীবের পাপ-তাপ ক্ষয় হয় এখানে। এখানে দেহত্যাগ কোরলে তার শিবপ্রাপ্তি হয়। দেশ-বিদেশের বড় বড় সাধক-পণ্ডিতের পায়ের ধুলো পড়ছে অবিরাম এখানকার মাটিতে।

মানুষের ভীড়ে পথ চলা যায় না। দেবমন্দির চারিদিকে ছড়ানো। দিনরাত কাঁসর-ঘণ্টা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত। বামাক্ষেপার মন যেন ছটফট করে। ভালই লাগছে না কাশী। এখানকার মানুষ পাণ্ডা সবার মধ্যে যেন তামসিক ভাব বর্তমান। এরাই আসে আবার বিশ্বনাথের দরবারে দিনরাত। বামাক্ষেপাকে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে মোক্ষদানন্দ আর কৈলাসপতি তাঁকে এক মঠে বসিয়ে বোলে গেলেন—তিনি যেন কোথাও না যান। তাঁরা দিন দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবেন!

বামাক্ষেপা মঠেই বসে থাকেন। মা তারার জন্য তাঁর মনটা ছট্‌ফট্ করে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর দেহ যেন অবসন্ন হোয়ে পড়ে। কে একজন এসে বামাক্ষেপাকে বোললে: তুমি যে বসেই আছো, প্রসাদ আনতে যাবে না? খাবে কি?

বামাক্ষেপা বিরক্ত হোয়ে বোললেন: কি, আমি যাবো প্রসাদ আনতে। ক্ষিধে পেলে মা-ই তো ছেলের মুখে খাবার দেয়। ছেলে আবার কবে কোথায় মার কাছে খাবার আনতে গেছে! কাশীতে দেখি যে সবই উল্টো। কই, আমার তারা মার কাছে তো আমাকে খাবার আনতে যেতে হয় না!

—তাহলে না খেয়ে বসে থাকো!

—আলবাৎ খাবার আসবে। তোর অন্নপূর্ণা মা-ই আমাকে

খাবার পাঠাবে। আমি থাকবো না খেয়ে, আর অন্নপূর্ণা ভোগ সাজিয়ে মজা কোরে খাবে। দেখি কেমন কোরে খায়!

—পাগল ছাড়া আর কি!

'জয় তারা' 'জয় তারা'……

বামাক্ষেপা যেন মায়ের উপর অভিমান কোরে মুখভার কোরে বসে আছেন। বেলা বেড়ে চলে। ক্ষুধায় তাঁর দেহ যেন অবসন্ন হোয়ে পড়ে। বামার একটু তন্দ্রা আসে।

খানিকক্ষণ পর একটা বুড়ি এসে ডাক দেয়ঃ এই, পেসাদ খাবিনে? ওঠ্—

বামাক্ষেপা ধড়মড় কোরে উঠে পড়েন।

একটা বুড়ির হাতে শালপাতায় নানান রকম খাবার।

বামা খান। পরমানন্দে খান আর বলেনঃ তুমি কেগা?

—কেন, ঐ যে বড় বাড়ি। কত লোকজন—ঐ বাড়িতেই আমি চাকরী করি।

বামাচরণ শালপাতাটা চেটে চেটে খান।

তাঁর সারা মুখে খাবার লেগে যায়।

হঠাৎ বামাক্ষেপা দেখেন যে সে বুড়ি আর নেই! এক লহমায় যেন অদৃশ্য হোয়ে গেলো।

তিনি চীৎকার কোরে ডাকেন—কোথায় গেলে গো, খাবার দিয়ে গেলে, জল দিলেনা তো!

—এই ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেনরে?

মঠের সেই লোকটি প্রসাদান্ন খেয়ে ফিরছে।

—কি গো। না খেয়েই তো আছো?

বামাক্ষেপা উচ্ছিষ্ট শালপাতাটা তার দিকে ছুঁড়ে দেনঃ এই ভাখ্। বোলেছিলাম না যে মা-ই পাঠাবেন খাবার। শালপাতা ভরে কত সন্দেশ, মিঠাই, পায়েস, আরও কত কি মা পাঠিয়েছিলেন।

লোকটি অবাক হোয়ে যায়।

কে মা তাকে খাবার পাঠালো কে জানে।

লোকটা চলে যায়।

বামাক্ষেপা ঘরের মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগ করেন। আপন মনে ঘরের ভিতর বিচরণ করেন। ঘরময় দুর্গন্ধে ভরে যায়। মঠের লোকরা তাঁকে পাগল ভেবে দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দেয়।

বামাক্ষেপা কিছু না বোলে বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। দূর, কাশীতে মানুষ থাকে! এর চেয়ে তারাপীঠ অনেক ভাল। সেখানে মা তারা আছেন। কিছু ভাবনা থাকে না!

তিনি তারাপীঠে ফিরে যাবেন। মোক্ষদানন্দ আর কৈলাসপতি বাবা সেই যে গেছেন আর ফেরবার নামটি নেই। বামাক্ষেপা তারাপীঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

কিন্তু তাঁর তো একটা পয়সা নেই কাছে। পরণে বস্ত্রও নেই। কোনমতে একটা ন্যাকড়া জড়ানো। পয়সা রাখার যায়গাও তো নেই!

বামাক্ষেপা কাশী স্টেশনের দিকে চলেন।

কোনদিক চেনেন না। জানেন না। কোন্ পথে স্টেশন তাও সম্পূর্ণ অজানা। চলেছেন তো চলেছেনই—পথ যেন আর ফুরোয় না। কাশীতে এত জ্বালা, এত কষ্ট পেতে হ'বে জানলে তিনি আর কাশীতে আসতেন না। স্টেশনে এসে যে ট্রেন পান সেই ট্রেনের একটা কামরায় চেপে বসেন।

কোনমতে একটা আসন পেয়ে বসে পড়েন।

ট্রেন ছুটে চলেছে ঝড়ের মত।

বামাক্ষেপা জানলার বাইরে তাকান আর ভাবেন—এ আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেরে বাবা! যাক যেখানে, মা তারার কাছে পৌঁছাতে পারলে হয়। কামরার ভিতর কেউ তাঁর সংগে কথা বোলছে না। কোন পোশাক নেই, গা খালি। কেউ কেউ পাগলই ভেবে নিল।

অনেকক্ষণ চলবার পর ট্রেন এসে কি একটা স্টেশনে থামলো। বামাক্ষেপা 'জয়তারা' বোলে একবার চেঁচিয়ে উঠলেন। কামরার ভিতর সবাই যেন কেঁপে ওঠে। টিকিট চেকার উঠে টিকিট চায় বামাক্ষেপার কাছে।

ক্ষেপা নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি।

টিকিট চেকার আবার বলেন: আপনার টিকিটটা দিন, যাবেন কোথায়?

ক্ষেপা হেসে বোললেন: টিকিট! মা তারার কাছে যেতে আবার টিকিট লাগে নাকি?

—বাজে কথা রাখুন। টিকিট দিন।

—টিকিট! হায় টিকিট বাবু! আপনি যখন এ দুনিয়ায় এসেছিলেন তখন কি আপনার টিকিট ছিল? আবার যখন এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন তখন কী টিকিট কাটবেন?

টিকিট চেকার অবাক হোয়ে যান—পাগলটা বলে কি!

পাশ থেকে একজন টিপ্পনী কাটে—ওর বোধহয় পাশ আছে!

ক্ষেপা এবার চটে যান: আছেই তো। মা তারাই তো আমাকে পাশ দিয়েছেন, তাইতো আমি চলেছি! মা তারার পাশ হোলে আর কিছু লাগেনা। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এক কোরে বেড়ানো যায়।

ক্ষেপা একটু থেমে বলেন: তবে এ পাশ কি আর সবাই পায়—কেউ কেউ পায়। যারা ভাল কাজ করে।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামলে ক্ষেপাকে টিকিট চেকারটি জোর কোরে নামিয়ে দিয়ে যায়।

ক্ষেপা ছোট্ট স্টেশনের বাইরে আসেন।

স্টেশনটির চারপাশে শুধু জংগল। লোকজনও বেশী নেই। একটা রাস্তা শুধু চলে গেছে কতদূর তা কে জানে।

মায়ের নাম স্মরণ কোরে ক্ষেপা পথ চলেন! দ্বিপ্রহরের কড়া রোদে পথ চলা দায়। এ পথ কোথায় গেছে তাও তিনি জানেন

না। চলেছেন তো চলেছেনই। রোদে হেঁটে হেঁটে শরীরটাও যেন তাঁর অবসন্ন হোয়ে পড়ে। ক্ষিধেও লেগেছে।

তিনি একটা গাছের তলায় বসে আপন মনে বলে ওঠেন: তারা মা, আর তোর অবাধ্য হবো না! কথা শুনিনি, তাই বুঝি এত কষ্ট দিচ্ছিস?

ক্ষেপা হঠাৎ একটু দূরে চেয়ে দেখেন একটা কুমারী মেয়ে হেলতে দুলতে তাঁরই দিকে আসছে। কাঁখে একটা কলসী। মেয়েটি এসেই বোললে: তুমি কোথায় যাবে গো?

ক্ষেপা বলেন: কোথায় যাবো তা তো জানিনা। কোথায় শেষ তাও জানিনা। তবে পথ যখন একটা পেয়েছি তখন বেয়ে যাব!

শেষটা একবার দেখতে হবে!

—এই মরেছে পাগল নাকি! বোলছি কোথায় যাবে!—তা না মাথায় পটলের ঝুড়ি।

—তারাপীঠ যাবো!

—ওরে বাবারে, সে যে এখান থেকে অনেক দূর।

—তা আর কি কোরব। তা তুমি কে?

—আমি গোয়ালাদের মেয়ে। যাচ্ছি ঐ গাঁয়ে দুধ দিতে।

—দুধ!

—হ্যাঁ। তুমি খাবে?

ক্ষেপা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মেয়েটি সামনে এসে ঘড়াটা নামিয়ে বোললে: নাও খাও!

ক্ষেপা হাত দুটো এক কোরে মুখের কাছে ধরে, আর মেয়েটি ঘড়া কাৎ করে দুধ ঢেলে দেয়।

ঢক্ ঢক্ কোরে অনেকখানি দুধ খেয়ে ফেলেন।

ক্ষেপা অনেকটা সুস্থ হন।

বলেন: এ যাত্রায় আমায় বাঁচালে।

মেয়েটি মুখটা বিকৃত কোরে বোললে : তা মরতে গিয়েছিলে কেন ? অবাধ্য হোলে তার এই অবস্থাই হয়।

—কি বোললি ! অতটুকু মেয়ের গলায় তো বেশ ঝাঁজ আছে ! চোখের নিমিষে মেয়েটি অন্তর্হিতা হয়।

বামাক্ষেপা চারিদিকে খোঁজেন আর দেখতে পান না।

যে তাঁর ওপর ভার দিয়ে রেখেছে সব কিছুর তাকে এমনি কোরেই ভগবান রক্ষা করেন।

বামাক্ষেপা হাঁটতে হাঁটতে তারপর একদিন তারাপীঠে পৌঁছান।

॥ সতের ॥

দুরন্ত বর্ষা নেমেছে সেই সকাল থেকে। আকাশ ঝাঁঝরা হোয়ে জল পড়ছে। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জনে যেন চারিদিক কেঁপে উঠছে। মহাশ্মশানের মাঝে গাছপালা বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এ ওর গায়। মড়্মড়্ মড়াৎ!—কোথায় বুঝি একটা ডাল ভেঙে পড়লো।' রাস্তাঘাট জলে জলময়। রুদ্র ভৈরবের কাল তাণ্ডব শুরু হোয়েছে। একি দুর্যোগ! সারা পৃথিবী বুঝি এখনই ধ্বংস হোয়ে যাবে।

বামাক্ষেপা অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে জলঝড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর একি হোল! আজ দীর্ঘ বার-তের বছর তিনি মা-ভাই-বোন সব ছেড়ে এসেছেন। এ রকম উদ্বিগ্ন মন তাঁর কেউ কোনদিন দেখেনি।

মহাশ্মশানের মাঝখান দিয়ে সরু পথটা দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি দ্বারকা নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঝম্ঝম্ কোরে বৃষ্টি পড়ছে। দ্বারকার স্রোত বন্য বরাহের মত ছুটে চলেছে। এপার ওপার সব যেন একাকার হোয়ে গেছে। বিদ্যুতের ঝল্কানীতে নদীর ঢেউ যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে!

দ্বারকার ওপারে একটা শবদেহ নিয়ে এলো কয়েকজন। সিদ্ধ-পুরুষ বামাক্ষেপা অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর মা আজই মারা গেছেন। মা—নেই এ কথাটা ভাবতে যোগী পুরুষ বামাক্ষেপার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কে জানে মৃত্যুর আগে হয়তো তাঁর দুঃখিনী মা তাঁকে একটু চোখের দেখার জন্য ব্যাকুল হোয়েছিলেন কিনা! তাঁর সমস্ত হৃদয় বিয়োগ-ব্যথায় বর্ষার জলের মতই টলমল কোরছে। সিদ্ধ-পুরুষ বামাক্ষেপার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। তাঁর চোখে জল।

মার জন্য কোন্ ছেলে না কাঁদে ?

তিনি কাঁদছেন মায়ের জন্য। মায়ার জন্য নয়। তবে তিনি শোক কোরছেন কেন ? অনিত্য দেহের জন্য শোক—না, না, কিসের শোক! ঐ তো মায়ের পবিত্র আত্মা ধীরে ধীরে চলেছে স্বর্গের দিকে। আত্মাকে ধ্বংস কোরবার শক্তি কারও নেই! দেহ নিয়ে যত শোক-তাপ-দুঃখ। আত্মার জন্য কারও চিন্তা নেই।

ওপারে চিতা সাজানো হোচ্ছে।

বামাক্ষেপার জ্ঞান সম্বিৎ ফিরে এলো।

এপারে তারা মায়ের পায়ের তলায় হবে না তাঁর মায়ের সৎকার ? চিরদুঃখিনী মায়ের শেষ সময় মা তারার চরণ পাবার ভাগ্য হবে না তিনি থাকতে ?

বামাক্ষেপা নদী সাঁতরে ওপারে চলে গিয়ে চিতার ওপর থেকে মায়ের শবদেহটা পিঠে নিয়ে এপারে চলে আসেন। সাধারণ মানুষ ঐ ভাবে আর একটা দেহ নিয়ে এলে দুজনেরই সলিল সমাধি হবার কথা। কিন্তু বামাক্ষেপা অনায়াসে এপারে মাকে নিয়ে এসে মহাশ্মশানে চলে এলেন। তাঁর অসাধ্য কোন কাজই বুঝি এ দুনিয়ায় নেই।

মায়ের শেষকৃত্য সুন্দরভাবে সমাধা হোল। ছোটভাই রামচন্দ্র দাদাকে জড়িয়ে ধরে। আকুল ক্রন্দনে সমস্ত শ্মশান যেন কেঁদে উঠলো।

বামাক্ষেপা শুধু বোললেন : ভয় কিরে রাম, বড় মা আছেন, ভাবিস কেন ? তাঁকে ডাক, তিনিই সব মুস্কিল আসান কোরে দেবেন।

—দাদা, আমাদের কি হবে ?

ক্ষেপা হাসেন : পাগল, কি আর হবে! কিছুই হবে না। যা, বাড়ি যা। মায়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কোরগে। বুঝলিরে, খুব ধুমধাম কোরে মায়ের শ্রাদ্ধ কোরতে হবে, আশপাশের পাঁচসাতখানা গ্রামের লোক খাওয়াতে হবে!

রামচন্দ্র মনে মনে অবাক হোয়ে ভাবে—

যাদের কিছুমাত্র সংগতি নেই তারা কি কোরে এতলোক খাওয়াবে? দাদার মাথার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই। বোলে দিলেন।

রামচন্দ্র বোললে: দাদা, এই কদিন কি কোরে যে হবিষ্যি কোরব তার নেই সংস্থান, আর বোলছ কিনা যজ্ঞের কথা!

বামাক্ষেপা রেগে গিয়ে বলেন: হ্যাঁ, যজ্ঞই হবে। তোর অত ভাবতে হবে না। কত লোক নিমন্ত্রণ হোলে কত জিনিস লাগে তার ফর্দ কোরছে একজন ঐখানে বোসে—

তারা মায়ের মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কোরলেন তিনি।

রামচন্দ্র মাটির দিকে মুখ নিচু কোরে বসে আছে।

বামাক্ষেপা তাকে ধরে তুললেন। পরে বোললেন: তুই যা রাম, কিছু ভাবিসনে। সব ঠিক হবে। আশপাশ গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ কোরবি, দেখিস, কেউ যেন বাদ না যায়।

রামচন্দ্র ভাবতে ভাবতে চলে আসে।

মায়ের শোক তার মাথায় উঠে যায়।

তবুও দাদার নির্দেশ। তাকে মানতেই হবে—বদনাম হয়—তার দাদার হবে। অমন দাদা থাকতে তার এত ভাবনা কিসের?

রামচন্দ্র বাড়ি এসে চারধারের জংগল নিজেই পরিষ্কার কোরে ফেললো। সাধ্যানুযায়ী সবকিছু পরিপাটি কোরে সাজালো।

দেখতে দেখতে মাতৃশ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে এলো। রামচন্দ্র এ কদিন শুধু নিমন্ত্রণই কোরে বেড়িয়েছে। দাদার নির্দেশ অন্যান্য কোরবার শক্তি তার নেই। কতলোকে অবাক হোয়ে গিয়েছে। কতলোক বলেছে, পাগলের গুষ্টীর কাণ্ডই আলাদা। গ্রামের কয়েক জন মাতব্বরও বারণ কোরেছে রামচন্দ্রকে—দেখো রামচন্দ্র, তোমার

দাদার না হয় মাথার ঠিক নেই, সেই সাথে তোমারও কি মাথা খারাপ হোল? লোক তো শুধু নিমন্ত্রণ কোরেই যাচ্ছো। বলি, খাওয়াবে কি—শেষকালে তোমাদের সাথে আমাদেরও মাথা হেঁট হবে। নাঃ, ও দিন দেখছি গ্রামে থাকা আর চলবে না।

রামচন্দ্র চিন্তিত হোয়ে বলে: সেকি কথা হারান কাকা! আপনারা না থাকলে চলবে কেন?

রামচন্দ্র একটু চুপ কোরে থেকে বলে: দাদা যে বোলেছেন, কাকা!

হারাণ ভট্টাচার্য এবার রেগে যায়: দূর! তোর দাদার নিকুচি কোরেছে। যে কুকুর শিয়ালের সাথে একসাথে বসে খায় সে আবার মানুষ নাকি! বংশের ধারা যাবে কোথায়? সব পাগল।

রামচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

মা তারাকে মনে মনে স্মরণ করে—বিপদে আপদে তিনিই তো রক্ষাকর্তা।

॥ আঠার ॥

শ্রাদ্ধের দিন রামচন্দ্র চুপ কোরে বসে আছে। বেলা তো বেড়েই চলেছে। কি যে হবে, কোন জিনিসই তো নেই, কখনই বা সব আসবে, কখনই বা রান্নাবান্না হবে।

রামচন্দ্র এভাবে বসে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে না কোরে সোজা তারাপীঠের পথে পা বাড়ালো। আজ বুঝি মান-ইজ্জৎ সব যায়। রামচন্দ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর ঘেমে নেয়ে উঠে সে তারাপীঠে মহাশ্মশানে এসে উপস্থিত হলো।

সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা তখন গভীরভাবে অচেতন।

একটা শিয়াল এসে তাঁর পা চাটছে, তা'ত তাঁর খেয়াল নেই!

রামচন্দ্র শুধু বোললে: দাদা, কি হবে?

বামাক্ষেপা চোখ খুলে বোলে উঠলেন: যা বাড়ি যা—হ্যাঁরে জিনিস-পত্তর সব যে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাহকরা। এ সময়ে তোর এখানে আসা ঠিক হয়নি!……

রামচন্দ্র বাড়ির পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে একরকম ছুটেই যায়। বাড়ীর সামনে গিয়ে যা দেখলো তাতে তার চক্ষুস্থির—ভারে ভারে জিনিস-পত্তর সব পৌঁছে গিয়েছে। হাঁড়ি হাঁড়ি দই-মিষ্টি, ময়দা-ঘি—নানারকম তরিতরকারী। এ সব কে পাঠালে, কোথা থেকেই বা এলো!……

রামচন্দ্র মহানন্দে মায়ের শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হোয়ে পড়লো।

বিকেলের কিছু আগেই সবকিছু তৈরী হোয়ে গেলো। সামনের বিরাট উঠানে লোকজন বসে গেলো। চারিদিকে হৈ-চৈ।

কিন্তু এমন সময় এক বিপদ দেখা দিল। সারা আকাশ মেঘে মেঘে কালো হোয়ে গেলো। দু একবার বিদ্যুৎও চমকালো। যা মেঘের ঘনঘটা তাতে মনে হলো সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যারা খেতে বসেছিল তারাও ব্যস্ত হোয়ে পড়লো।

রামচন্দ্রের চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল গড়াচ্ছে। একি সর্বনাশ! তার মায়ের শ্রাদ্ধ এমন কোরে পণ্ড হোয়ে যাবে তাতো সে আগে জানতে পারেনি।

এমন সময় দূরে দেখা গেলো এক জটাধারী সন্ন্যাসী। এক হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আর এক হাতে একটা ত্রিশূল নিয়ে 'জয়তারা' 'জয়তারা' বলতে বলতে আসছেন। কি অপরূপ বেশ সন্ন্যাসীর। পরনে রক্তবর্ণ গেরুয়া। কপালে মস্তবড় এক সিঁন্দুরের টিপ।

সন্ন্যাসী বামাক্ষেপা।

রামচন্দ্র দাদার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো: দাদা, কি নিদারুণ মেঘ দেখেছো?

বামাক্ষেপা যেন হুংকার ছেড়ে উঠলেন: কি, আমার মায়ের শ্রাদ্ধ, আর তা পণ্ড হবে? যা, পরিবেশন কোরতে লেগে যা। সারা দুনিয়া যদি জলে ভেসে যায় তবুও আমার এই গণ্ডীর ভেতর এক ফোঁটা জলও পড়বে না। যদি পড়ে তাহলে আজ এই ত্রিশূলের ঘায়ে ঐ আকাশ আমি নীচেয় নামিয়ে নিয়ে আসবো!

'জয়তারা' বোলে ত্রিশূল দিয়ে তিনি চারিপাশে গণ্ডী কেটে দিলেন।

ঝম্ ঝম্ কোরে বৃষ্টি নামলো।

কিন্তু সবাই পরম বিস্ময়ে দেখলো যে আশপাশ দিয়ে তুমুল বর্ষণ হোচ্ছে, কিন্তু বামাক্ষেপার গণ্ডীর মধ্যে এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে না।

রামচন্দ্র অবাক হোয়ে যায়।

এ অলৌকিক ব্যাপার ঘটলো কি কোরে? তার দাদা কে?

অদূরে বামাক্ষেপা রক্তচক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে।

মনে হোচ্ছে কৈলাস থেকে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব নেমে এসেছেন আটলার মাটিতে। বৃষ্টির ধারাকে যিনি বাধ্য করাতে পারেন তিনি শুধু অসাধারণ নয়—অনন্যসাধারণ।

সাধনা দিয়ে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে যে দেবতাও বশ হয় তার প্রমাণ বামাক্ষেপা।

ভগবানের সংগে একাত্ম হোয়ে গেলে তখন সেও আর মানুষ থাকে না। সেও ভগবান হোয়ে যায়। তখন মানুষে আর ভগবানে কোন প্রভেদ থাকে না।

মানবদেহধারী বামাক্ষেপা আজ বুঝি সত্যসত্যই দেবতা হোয়ে গেছেন।

॥ উনিশ ॥

সিদ্ধাসনের কিছুদূরে জংগলে ঘেরা বামাক্ষেপার আশ্রম। চারপাশে শুধু মৃতের হাড়গোড় আর মড়ার খুলি। সব সময় শিয়াল কুকুর আশ্রমের চারপাশ দিয়ে ঘুরছে। বামাক্ষেপার সংগে সব সময় তারা সাথীর মতই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারাপীঠ মহাশ্মশানে সব সময়ই লোক আসছে যাচ্ছে। কত দেশ থেকে আসছে। কত দূর-দূরান্ত থেকে গাড়ীতে, হেঁটে, গরুর গাড়ীতে কোরে মানুষ আসে। মা তারার মন্দির দেখা হোলেই তো তারাপীঠের সব দেখা হয় না। তারাপীঠে এসে বামাক্ষেপার কাছে না এলে যেন তারাপীঠে আসা তাদের সার্থক হয় না। আসে ভোগী। আসে যোগী। আসে রোগী। কত রকম রোগ। কত রকম ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ আসছে আর যাচ্ছে। তারাপীঠ যেন মানুষের জীবনপথের একটা জংশন স্টেশন! এখান থেকেই বুঝি কে কোথায় যাবে আর কোন্ পথে যাবে তার নির্দেশ মেলে।

বামাক্ষেপা মাঝে মাঝে বিরক্ত হোয়ে বলেন : আমি কি ডাক্তার যে সবাই আসে আমার কাছে রোগ সারাতে। হ্যাঁরে, আমি কে! আমিও যা তোরাও তো তাই! আসল ডাক্তারের কাছে যা। তিনি যে পাশ করা ডাক্তার। তাঁর কাছে গেলে আর ওষুধ লাগে না। তাঁর চরণামৃত খেলেই তো সব সেরে যায়। শালারা শুধু আমার কাছে আসে।

একটু থেমে বলেন : ওরে, আমি যে মা তারার কম্পাউণ্ডার। সে লিখে দেবে তবে তো আমি ওষুধ দেবো। যা যা, তাঁর কাছে যা।

বামা আর কোন কথা বলেন না। শুধু চোখ বুজে কি যেন বিড়বিড় করেন।

খানিকক্ষণ পর বামাক্ষেপা চীৎকার কোরে ওঠেন : শালারা পাপ কোরবার বেলায় মনে থাকে না। তোরা কোরবি পাপ, আর মা তারা বুঝি ভোগ কোরবেন! অত বোকা মেয়ে তাঁকে পার্সনি। আবার আপন মনেই বোলে ওঠেন : কিন্তু না কোরেও তো উপায় নেই। মা তারা যে বিশ্বজননী। দায়-দায়িত্ব সবই তো তাঁর। সন্তান পাপী হোলেও মা তো তাকে ফেলে দিতে পারেন না। মা যে দয়াময়ী! ওরে, তোদের কথা ভেবে ভেবেই মা তো আমার কালী হোয়েছে। মায়ের ভুবনমোহিনী রূপ দেখতে হোলে ছেলের মত ছেলে হোতে হবে।

একটা লোক কি রোগ হোয়েছে তা কে জানে—সে ক্রমাগত ধুঁকছে আর হাত জোড় করে কি যেন বোলতে চাইছে।

বামাক্ষেপা তাকে স্নেহমাখা সুরে বোললেন : হ্যাঁরে, মার কাছে এসে এমন নিরানন্দ কেন?

তিনি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই সে যেন সোজা হোয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—বাবা, তুমি ঠিক ভগবান!

—শালা! ভগবান যদি তোর গায়ে হাত দিত তাহলে কি আর 'খাবো' 'খাবো' কোরে এমনিভাবে ছুটে বেড়াতিস। তুই যে তার সাথেই মিশে যেতিস। আমি কেউ নইরে! তবে আমি হোচ্ছি তারা মায়ের পায়ের ধূলো!......

লোকটি এগিয়ে এসে বামার পায়ের ধূলো নিতে যায়।

বামা পেছিয়ে যান—বলেন : কলিকালের মানুষ ভারী স্বার্থপর, আজ যদি তুই ভাল না হতিস তাহলে কি আর বামার পায়ের ধূলো নিতে আসতিস! তোরা পেলেই খুশি—কিন্তু যা পেলে আরও খুশি হোস তাঁর খোঁজ তোরা একজনও করিসনে, তাইতো দুঃখ-যন্ত্রণা

পাস। এ জনমে তোরা নিতেই এসেছিস। নিয়ে নিয়েই ঘর ভরলি। মন ভরিল। দিলিনে কিছুই। কেবল ধন দাও, ঐশ্বর্য দাও, বাড়ি দাও, স্ত্রী দাও, ছেলেমেয়ে দাও, সুখ দাও, শান্তি দাও। এ কথা তো বোলতে পারলি না—আমাকে ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, আমাকে তোমার কোরে নাও!

বামাক্ষেপা আর কিছু না বোলে আশ্রমের ভিতর চলে গেলেন।

মা তারাতে আর বামাক্ষেপাতে কোন প্রভেদ নেই।

তাই ক্ষেপার পরশে অন্ধও চোখের দৃষ্টি ফিরে পায়। খঞ্জও সোজা হোয়ে চলে। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষও সুস্থ হোয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে যায়। মহাশ্মশান নিস্তব্ধ। শিয়াল-কুকুরগুলো ইতস্ততঃ ছোটাছুটি কোরে বেড়ায়। শিরশিরে হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরে যায় শিমূলতলায়। পাতাঝরার গানের সাথে বামার কণ্ঠও শোনা যায়—

"আমি ক্ষেপার খাস্ তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা।
চেননা আমারে শমন, চিনবে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা।"

বেলগ্রামের নিমাই হার্নিয়া রোগে ভুগছে। সংসারে অভাব অনটনের জ্বালায় মানুষ হোয়েছে পাগল,—তারপর যদি ঐ রকম মারাত্মক রোগ হয় তাহলে তো আর তার বেঁচে থাকাতেও সুখ নেই।

নিমাই ঠিক কোরল সে আত্মহত্যা কোরবে। একগাছা দড়ি নিয়ে সে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে মহাশ্মশানের ভিতর ঢুকে পড়লো। গাছতলায় এসে চারিদিকে চেয়ে দেখলো কেউ নেই। গাছে উঠতে

যাবে এমন সময় 'জয়তারা' 'জয়তারা' বোলতে বোলতে বামাক্ষেপা একেবারে নিমাইয়ের সামনে দাঁড়ালেন।

বামাক্ষেপা একবার তার দিকে চেয়ে বোললেন : হ্যাঁরে, আত্ম-হত্যা কোরতে এসেছিস—এ যে মহাপাপ !

বাধ্য হোয়ে নিমাইকে তাঁর সাথে পেছু পেছু আসতে হয় আশ্রমে। বামাক্ষেপা আশ্রমের উঠানে দাঁড়ালেন।

নিমাই কি যেন বোলতে যাবে এমন সময় ক্ষেপা তার তলপেটে এমন লাথি মারলেন যে সে 'বাবা' 'বাবা' কোরে অজ্ঞান হোয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

বামাক্ষেপার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আপন মনে গাঁজা টানেন। হঠাৎ নিমাই উঠে দাঁড়ালো—একি ! সে যে সুস্থ মানুষ, কোথায় তার হার্নিয়া।

বামাক্ষেপা বোললেন : কিরে, নিমে শালা, মরলিনে ! নিমাই বোললে তাঁর পায়ের উপর পড়ে : আমি বেঁচে গেছি। বামাক্ষেপা অন্তর্যামি মহাপুরুষ।

সারা মানুষের হৃদয়েই যেন তাঁর আনাগোনা। সবাই যে তাঁর আপনার।

তিনি বোললেন : নিমে, এই শালা ওঠ ! এখানে না, মা তারার পায়ের ওপর পড়ে মরগে যা। বেঁচে যাবি, আর জন্ম হবে না।

নিমাই হাতজোড় কোরে বলে : সে ভাগ্য কি আর আমি কোরেছি ঠাকুর। আমি যে মহাপাপী।

—তাইতো আত্মহত্যা কোরতে এসেছিলি, যা দূর হ, নইলে এই চেলাকাঠ দিয়েই তোর মাথা ভাঙবো !

নিমাই ছুটে পালায় !

বামাক্ষেপা হো হো কোরে হেসে ওঠেন : মা তারা, দেখছিস কলির মানুষ ! এদের তুই বাঁচা। এদের তুই আপন কোরে নে

শিমূলতলায় আসনে ক্ষেপা বসে আসেন। আশপাশেই তাঁর প্রিয় কুকুরগুলো শুয়ে আছে। এমন সময় কয়েকজন লোক একটা মুমূর্ষু রোগীকে দড়ির খাটে কোরে নিয়ে এলো। যক্ষ্মা রোগে সে আজ অনেকদিন থেকে ভুগছে। আর বাঁচার আশা নেই দেখে সবাই নিয়ে এসেছে ক্ষেপার চরণতলে ফেলে রাখবার জন্য।

ক্ষেপা বোলে ওঠেন : কিরে, এটাকে আবার নিয়ে এলি কেন, জ্যান্তই পোড়াবি নাকি ? শালা জীবনে অনেক পাপ কোরেছে, ওকে ঠেঙিয়ে মার।

একটু থেমে বলেন : শালারা সব ভেবেচে কি ? আমি কি পাপের গুরু না বচ্ছি ?

হঠাৎ ক্ষেপা এক লাফ দিয়ে এসে রোগীর গলাটা টিপে ধরলেন। রোগীর তো জীবন যায়। চোখ দুটো তার কপালে উঠেছে। সবাই ছুটে এলো—ও যে মরে গেলো!

—চুপ কর। ওর পাপগুলোকে আগে শেষ করি।

কিছুক্ষণ পর ক্ষেপা তাকে ছেড়ে দিলেন।

সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলো যে লোকটি খাটিয়ার ওপর উঠে বসে বাবাকে প্রণাম কোরছে হাতজোড় কোরে। তারপর খাটিয়া থেকে নেমে বোলল : চল, আমার রোগ সেরে গেছে।

একবার একটা মেয়ে তার বাবার সাথে বামাক্ষেপাকে দর্শন কোরতে আসে—সংগে ভাল সন্দেশ নিয়ে এসে ক্ষেপাকে দেয়।

ক্ষেপা পরমানন্দে খান আর বলেন : মা, তুই খুব ভাগ্যবতী। তোর ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে।

মেয়েটার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। শেষে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—হ্যাঁরে, কাঁদিস কেন ? হ্যাঁগো মেয়ের বাবা, বল না গো, ও কাঁদে কেন ?

—ও যে বিধবা, বাবা। ওর কি কোরে ছেলে-মেয়ে হবে?

—ওরে হবে। আমার মা তারার কথা কি কখনও মিথ্যে হয়! দেখিস হবে।

পরে কিন্তু বামাক্ষেপার কথা ফলেছিল। মেয়েটির ধনীর ছেলের সংগে বিয়ে হোয়েছিল ও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করেছিল।

॥ কুড়ি ॥

সেবার তারাপুর ও তার চারপাশের গ্রামের মানুষের দুঃখদুর্দশার শেষ নেই, আকাশে জল নেই। মাটি ফেটে ফুটিফাটা হোয়ে হাঁ কোরে আছে। তৃষ্ণায় মা বসুন্ধরার যেন বুক শুকিয়ে গেছে। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে।

সবাই ছুটে এলো বাবার কাছে। কেউ বোললে—উপায় করো। কেউ বোললে—এ সনে আর বাঁচবো না।

বামাক্ষেপা বোললেন: ওরে, মা তারার গোটা রাজ্যে যদি হাহাকার পড়ে যায় তাহলে ঐ মন্দিরে কি আর তিনি থাকতে পারবেন। ছেলে কাঁদলে মা কি চুপ কোরে থাকতে পারে? প্রাণ ভরে মাকে ডাক সবাই। জল হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

একজন বোললে: বাবা, আমরা কি সেই পুণ্য কোরেছি যে তাঁকে ডাকতে পারবো, আমাদের ডাক তিনি শুনবেন কেন?

—একশোবার শুনবেন, মেহারের সর্বানন্দর ডাকে মা অমাবস্যার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের ডাকে বেটি ঘরামি হোয়ে ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। তোদের কথাও শুনবেন। যা না সব একজোট হোয়ে মার মন্দিরে। প্রাণভরে ডাক্।

একজন বোলে উঠলো: না ঠাকুর, আমাদের মধ্যে এমন পুণ্যবান কেউ নেই যে মা আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন।

বামাক্ষেপা এবার গর্জে উঠলেন: কি? জল হবে না? আমি বেটির মন্দিরে বাজ ফেলবো, দেখি কে রক্ষা করে!

সন্ধ্যার কিছু আগে হঠাৎ কোনখানে কিছু নেই—অকস্মাৎ আকাশে একটা বিদ্যুতের চমকানি লাগে, আর পরক্ষণেই কড় কড় কড়াৎ শব্দে চারিদিক কেঁপে ওঠে। সবাই দেখলো মন্দিরের এক কোণ ভেঙে গেছে।

পরদিনই অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। মাঠঘাঠ সব ভেসে যায় জলে। সেবার এত জল হয় যে তারাপুরের মানুষ দুদিন পথে বার হোতে পারেনি।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বামাক্ষেপা আশ্রমের উঠানে এসে চীৎকার কোরে উঠলেন: আমি আজ আগুন দিয়ে সব পোড়াবো।

দু-চারজন ভক্ত বোলে ওঠে: সে কি বাবা! আগুন লাগাবে কেন?

—হ্যাঁ! আমি লাগাবো।

ক্ষেপা ধুনির আগুনে একটা মশাল জ্বেলে মহাশ্মশানের মাঝখান দিয়ে গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়েন। কি একটা কাণ্ডই না ঘটিয়ে দেন পাগল আজ তা কে জানে!……

মাঝরাতে হঠাৎ দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। লক্ লক্ কোরে আগুনের মুখে সব কিছু গ্রাস হোচ্ছে। দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বলছে—গ্রামের লোক নিরুপায় হোয়ে ছোটাছুটি কোরতে কোরতে এসে দেখে বামাক্ষেপা নৃত্য কোরছেন মহানন্দে আর বোলছেন: মা তারা, ওদের একটু শিক্ষা দিলাম। তোরই দয়ায় শালারা সব ফসল গোলাজাত কোরে মহানন্দে ঘুম মারছে। কই, তোর কথা তো কারও মনে নেই।

সবাই এসে বামাক্ষেপাকে ধরে ফেলে। এ ঠিক ক্ষেপারই কাজ। তিনি ছাড়া একাজ আর কেউ করেননি।

একজন তো মারমুখী হোয়ে এসে বোললে: পাগল ঠাকুর, গ্রামের মানুষের যে কী ক্ষতিটা হোল তা বুঝতে পারছো, ধান পুড়ে গেলো, ঘর পুড়ে গেলো। গরু-বাছুরও দুএকটা কি আর পোড়েনি। তোমাকে এখন জ্যান্ত পোড়ালেও আমাদের রাগ যায় না।

বামাক্ষেপা খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে ভাবলেন—ঠিক, কাজটা তাঁর অন্যায় হোয়েছে। তিনি কাউকে কিছু না বোলে সোজা জ্বলন্ত

আগুনের মাঝে গিয়ে চীৎকার কোরে বলেন : তোদের শান্তি হোল ত, আগুনেই পুড়লাম আমি।

হুড়মুড় কোরে একটা জ্বলন্ত খড়ের চাল তাঁর মাথায় ভেঙে পড়লো।

সবাই চীৎকার কোরে উঠলো : ক্ষেপা পুড়ে মরেছে।

ভোর হোতেই আগুন নিভে গেলো।

তাড়াতাড়ি সবাই পোড়া খড় সরাতে ব্যস্ত হোল। ক্ষেপার দেহটা খুঁজে বার কোরতে হবে ; অন্তত কিছুটা পাওয়া গেলেও তাই সৎকার করা যাবে। পোড়া গন্ধে পাড়া মাৎ হোয়ে যায়। কিন্তু ক্ষেপার একখানা হাড়ও পাওয়া যায় না।

পরে কে একজন এসে সংবাদ দিল যে ক্ষেপা দিব্যি মহাশ্মশানে বসে মহানন্দে গান কোরছেন।

গ্রামের সবাই ছুটে যায়—

বামাক্ষেপার গানে তখন মহাশ্মশান কাঁপছে—

"এবার কালি তোমায় খাব
গণ্ডযোগে জন্ম আমার মা
গণ্ডযোগে জন্ম হোলে
সে হয় মা খেকো ছেলে
এবার তুমি খাও কি, আমি খাই মা
ছুটোর একটা কোরে যাব।"

ইসারায় বামাক্ষেপা সবাইকে বসতে বলেন।

—শোন্। তোরা যে যে ভাবে পারিস মায়ের ছেলে হ। মা তারাকে না ডাকিস শ্রীকৃষ্ণকে ডাক্। ঈশ্বরের আবার স্ত্রী-পুরুষ কি? তাঁকে যে যে ভাবে ইচ্ছে ডাকতে পারে। ডাকতে ডাকতে এমন হবে যে তখন আর মনে হবে না কে পুরুষ, কে নারী। তখন সব একাকার। ওরে, ধর্ম ছাড়া কলির জীবের উদ্ধার নেই। ধর্মই

তো মুক্তির সন্ধান দেবে। ধর্ম আছে তাই বেঁচে আছিস। ধর্মছাড়া হোসনে।

একজন বোললে : বাবা, আমরা তো অজ্ঞান!

—কে বোললে—মা-ই তো জ্ঞানরূপে বিরাজ কোরছেন তোদের দেহের মাঝে, তাঁকে দেখ, তাঁকে জাগা। মা ঘুমোলে কি সন্তান রক্ষা পাবে। তার জন্য গুরু ধরতে হবে বাবা। গুরুই তো হাত ধরে পথে নামাবেন। মানুষকে তিনিই শক্তি দিয়ে অমৃতপথ সন্ধান দেবেন। এই কলিযুগে শক্তি সাধনা আর হরির নামই পরম বস্তু, আর সবই অনিত্য।

বামাক্ষেপা চোখ বুজলেন।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। পূর্ণিমার আলো যেন সবার ঘরে অকৃপণ হোয়ে ঝরে পড়ছে! বামাক্ষেপা আসনে বসে আছেন চক্ষু মুদে।

তারাসুন্দরী অপরূপ সাজে সজ্জিতা হোয়ে আশ্রমের পাশে এসে দাঁড়ায়। পরণে তার দামী একটা শাড়ী। গলায় মুক্তার হারের মত কি যেন ঝকঝক কোরছে। কাজল দেওয়া চোখের দুপাশে কপালের ঠিক মাঝখানে একটা কুমকুমের টিপ। উছল যৌবন যেন সারা অঙ্গে টলমল কোরছে। স্বর্গ থেকে যেন উর্বশী বা মেনকা কেউ নেমে এসেছে।

তারাসুন্দরী শহরের নাম করা গণিকা।

কয়েকটি দুষ্ট লোক তাকে লোভ দেখিয়ে ক্ষেপার কাছে পাঠিয়েছে তাঁকে পথভ্রষ্ট কোরতে।

তারাসুন্দরী ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে।

পীনোন্নত বক্ষ যেন চলার ছন্দে নাচছে!

অন্তর্যামী ভগবান সবকিছুই টের পান।

তারাসুন্দরী এগিয়ে গিয়ে বামাক্ষেপাকে জড়িয়ে ধরে বলে : বড় কামাতুরা আমি। একটু শান্তি আমায় দাও।

বামাক্ষেপা চোখ মেলে চেয়ে বলেন : কে রে, মা এলি নাকি? আমার যে ক্ষিধে পেয়েছে, দুধ দিবি না?

এই কথা বোলে বামা সজোরে তাকে ধরে তার স্তন চুষতে শুরু করেন।

তারাসুন্দরী 'মলাম' 'মলাম' বোলে চীৎকার কোরে ওঠে।

ক্ষেপা স্তন চুষে একেবারে রক্ত বের কোরে এনেছেন।

তারাসুন্দরীর পীনোন্নত বক্ষ রক্তরাঙা। যেন দুটো লাল পঞ্চমুখী জবা ফুটে আছে তারাসুন্দরীর বক্ষে।

বামাক্ষেপার মুখে রক্ত—নীলকণ্ঠ হোয়ে সে যেন তারাসুন্দরীর সব কিছু চুষে নিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বোললেন : তবে যা, আর আসিস্‌নে কোনদিন।

তারাসুন্দরী চলে যায়।

॥ একুশ ॥

বামাক্ষেপার দিব্যজীবনের অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। কত জায়গার লোক নিত্য এসে ভীড় করে এই মহাসাধককে দর্শন করার জন্য তারাপীঠ মহাতীর্থে।

বামাক্ষেপার ভিতর দিয়ে মা তারা যেন দিন দিন আরও প্রকাশ হোতে থাকেন! যাঁরা বলেন, ঈশ্বর নেই, তিনি নিরাকারও নন সাকারও নন, ওটা একটা ভ্রম। বিজ্ঞানই সব। মানুষের জন্ম-মৃত্যু শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই বিজ্ঞানের করায়ত্ত! জড় বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন এটম্, দূরের মানুষকে কাছে টেনে এনেছেন। তাঁরা একবার এসে দেখে যান তারাপীঠের চৈতন্য-বিজ্ঞানীকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এখানে একাকার হোয়ে গেছে। পরম ব্রহ্মই তো জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছু। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মানুষ একে স্বীকার কোরে নিয়েছে। বেদ-পুরাণ, উপনিষদ, গীতা আজ তারা হৃদয়ে এঁকেছে, তাই তারা হৃদয় জয় করার অভিযানে মত্ত হোয়েছে। শান্তি চাই, পরম শান্তি—এতো গীতারই কথা।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

নিরক্ষর পরমজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপার পূজার্চনাকে মন্দিরের অন্যান্য সবাই ভাল চোখে দেখেন না। ক্ষেপা ইচ্ছেমত ফুল-বেলপাতা ছড়িয়ে দেন। কখনও নিজের মাথায় দিয়ে বসে থাকেন। মায়ের ভোগ দিতে গিয়ে নিজেই আগে খেয়ে বসেন। হঠাৎ সেদিন ক্ষেপা এক কাণ্ড কোরে বসেন। মায়ের মূর্তিতে ফুল দিতে দিতে মন্দিরের ভিতরই মূত্র ত্যাগ কোরলেন। তিনি যেন সরল শিশু, কি

কোরছেন, তা তিনি জানেন না। পুরোহিত ও অন্যান্যরা দেখতে পেয়ে তাঁকে খুব মারধর কোরে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিল।

ক্ষেপা বোললেন : মুতেছি বেশ কোরেছি, মায়ের কোলে ছেলে মুতবে না তো কি মুতবে তোদের বাবার মুখে।

বামাক্ষেপা মহাশ্মশানে গিয়ে তাঁর আশ্রমে বসলেন। তাঁর যেন ছুটি মিলেছে। তাইতো চায়, মায়ের কোল ছেড়ে নড়তে নো হোলে তিনি আর কোথাও যেতে চান না।

ক্ষেপা আপনমনে বিরক্ত হোয়ে বলেন : থাক বেটি না খেয়ে, আমি তার কি কোরব। তোর সাথে যে আমারও উপোস—দেখি এবার মা বেটাতে ক'দিন কে না খেয়ে থাকতে পারে ।

তিনদিনের দিন রাত্রে নাটোরে রাণীভবানী ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। সারা ঘর অপরূপ এক জ্যোতিতে ভরে গেছে। মায়ের স্বপ্নাদেশ হয় : ওরে! আমি তারাপীঠ থেকে চললাম।

রাণীভবানী ব্যাকুলকণ্ঠে বোলে ওঠেন : সে কি মা, কিসের ত্রুটি হোয়েছে ?

আবার স্বপ্নাদেশ হয় : আমি আজ তিনদিন উপবাসী, আমার সাথে বামাও আজ তিনদিন উপবাসী।

স্বপ্নাদেশ শোনার পর রাণীভবানী চঞ্চল হোয়ে ওঠেন—কি এক অজানা আশংকা যেন তার সারা চিত্তে দোলা দেয়। তিনি নায়েব মশাইকে ডেকে সংগে সংগে নির্দেশ দেন তখনি তারাপীঠে যেতে, আরও হুকুম দিলেন যে বামাক্ষেপাই মা তারার পুজো করবে, তার কাজে যেন কেউ বাধা না দেয়।

নায়েব মশাই সংগে সংগে তারাপীঠে রওনা হন নানারকম দ্রব্যসম্ভার নিয়ে।

তারাপীঠে পৌঁছে তিনি রাণীভবানীর আদেশ যথাযথ পালন করেন।

॥ বাইশ ॥

কোলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক তারাপীঠ যাবার মনস্থ করেন। হাওড়া থেকে ট্রেন ন'টায়। ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বের হলেন প্রায় পৌনে আটটায়। এই আশায় যে একঘণ্টার ওপর সময় আছে, ঠিক ট্রেন ধরতে পারবেন। ভদ্রলোক কোনদিন তারাপীঠ যাননি। এই প্রথম তাঁর তারাপীঠ যাত্রা! রাস্তায় বেরিয়ে তাঁর মনে পড়লো বামাক্ষেপা গাঁজা ও মদ খেতে ভালবাসেন। ছুটলেন গাঁজার দোকানে—তখন রাত্রি আটটা বেজে পনেরো মিনিট। গাঁজার দোকান বন্ধ হোয়ে গেছে সূর্যাস্তের পর। সরকারী নিয়ম। দোকানদার একটা দরজা খুলে হিসেব কোরছিলেন।

ভদ্রলোক বোললেন ব্যস্তভাবে : মশাই, গাঁজা দিতে হবে যে!

দোকানদার অবাক হোয়ে বলেন : মশাইয়ের কি জানা নেই যে গাঁজার দোকান কখন বন্ধ হয়?

—তা তো জানি, কিন্তু আমার যে দরকার। আমি তারাপীঠ যাবো। বামাক্ষেপা গাঁজা বড় ভালবাসেন।

দোকানদার একটু চুপ কোরে থেকে বোললেন সহকারীকে : ওহে! দু'ভরি গাঁজা দিয়ে দাও।

সহকারী বোললেন : আজ্ঞে, হিসেব তো হোয়ে গেছে আজকের, কি কোরে দেবেন?

দোকানদার রেগে বোললেন : দোকানের হিসেব পরে হবে। জীবনের হিসেবটা একটু দেখেনি আগে—তাড়াতাড়ি দাও, ভদ্রলোকের নটায় ট্রেন।

ভদ্রলোক দাম দিতেই দোকানদার একভরির দাম না নিয়ে বোললেন : মশাই কি একা একাই পুণ্য কোরতে চান? এক

ভরি আপনার, আর এক ভরি আমার নাম কোরে দেবেন। ব্যবসাদার কিনা।

ভদ্রলোক গাঁজার দোকান ছাড়িয়ে এসে তাড়াতাড়ি এক মদের দোকানে ঢুকে পড়লেন—রাত্রি তখন পৌনে ন'টা।

—ভাল বিলিতি মদ এক বোতল দিন তো তাড়াতাড়ি।

—দিচ্ছি! তা এত তাড়াতাড়ি কোরছেন কেন, কোথায় যাবেন?

—তারাপীঠ।

দোকানদার মদের বোতল তার হাতে দিয়ে বোললেন: ক্ষেপা বাবার দর্শন আমার আর হোল না—তা আপনি এই বোতলটা বাবাকে নিবেদন করে বোলবেন—কোলকাতা থেকে এক অধম হরেন সাহা এই বোতলটা পাঠিয়েছে। একটু আশীর্বাদ যেন তিনি করেন। দাম আর লাগবে না, আপনি যান চট কোরে।

ভদ্রলোক একরকম গলদঘর্ম হোয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে দেখলেন ন'টা বেজে পনেরো মিনিট হোয়ে গেছে। ট্রেন ছাড়েনি। ইঞ্জিনের কল বিকল হওয়ায় এই বিপর্যয় হোয়েছে। ভদ্রলোক 'মা তারার' নাম স্মরণ কোরে একটা কামরায় এসে উঠলেন।

সারা পৃথিবী জয়ের আনন্দ তার চোখে-মুখে। এটাকে তিনি মা তারার কৃপা বোলেই ধরে নিলেন।

ভোরবেলায় বোলপুরে এসে ভদ্রলোক কার ডাকে যেন জেগে উঠলেন।

—টিকিটটা দিন।

ভদ্রলোক বোললেন অত্যন্ত লজ্জিতভাবে—নানান ব্যস্ততায় ট্রেন ধরেছি, টিকিট কাটতে পারিনি—আমি যাবো তারাপীঠ, রামপুরহাট পর্যন্ত যে ভাড়া হয় নিয়ে নিন।

ভদ্রলোক পকেটে হাত দিতেই চেকারটি বোললেন: থাক আর

টাকা বার কোরতে হবে না—এতদূর যখন মা তারা এনেছেন তখন এ ক'টা স্টেশনও তিনি নিয়ে যাবেন। আপনি আমার হোয়ে একটা পূজা দেবেন মন্দিরে, ওতে আমার টিকিটের দাম পাওয়া হবে।

চেকারটি রামপুরহাটে নেমে গেলেন।

এখনও দেখেছি ট্রেনে উঠে তারাপীঠ যাবো বললে সংগে সংগে সব চেকারদের মাথা নীচু হোয়ে যায়। মায়ের নামে তাঁরা আর টিকিট চান না। তাঁরা জানেন যে পুণ্য কোরতে বেরিয়ে গোড়াতেই কেউ ফাঁক রেখে যান না।

ভদ্রলোক তারাপীঠ পৌঁছেই আগেই বামাক্ষেপার আশ্রমে চলেছেন। মনের বাসনা স্যুটকেসের মধ্যেকার বোঝা হালকা কোরে তবে মাতৃদর্শন কোরবেন।

নিস্তব্ধ শ্মশানে বামাক্ষেপা আসনে বসে আছেন। পাশে সব ভক্তবৃন্দ। ভদ্রলোক স্যুটকেসটি নামিয়ে ক্ষেপার উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম কোরে দাঁড়ালেন।

বামাক্ষেপা একটু হেসে তাঁর দিকে চেয়ে বোললেন : দাঁড়িয়ে রইলি যে, স্যুটকেসটা খোল্, সকাল থেকে গাঁজার জন্য পেট ফুলে উঠলো। হ্যাঁরে, হরেন সাহা যে মদের বোতলটা দিয়েছে তা বেশ ভাল মদ তো!

ভদ্রলোক চমকে যান।

তিনি কি কোরে জানলেন! ভদ্রলোকের বাকশক্তি রহিত হোয়ে গেছে। সাধুপুরুষদের মহিমাই আলাদা। তাঁদের লীলা বোঝবার শক্তি সাধারণ লোকের কোথায়?

—দে, আগে গাঁজাটা খেয়ে নি।

ভদ্রলোক গাঁজাটা বার কোরে তাঁর হাতে দেন। গাঁজা খাওয়া হোয়ে গেলে বোললেন: দে, বোতলটা ফট্ কোরে দি।

বামাক্ষেপা মড়ার খুলির একটা পাত্রে শুধু মদ ঢালেন আর খান।

ভদ্রলোক অবাক হোয়ে বলেন: আপনি এত মদ খান কেন?

বামাক্ষেপা মুখটা একটু বিকৃত কোরে বলেন: কইরে মদ খাই কোথায়! এই দেখনা—

বোলেই ক্ষেপা পাত্রটি তার দিকে এগিয়ে দিলেন: দেখ, এটা কি?

ভদ্রলোক পরম বিস্ময়ে দেখেন—পাত্র ভরা দুধ।

তাঁর মুখে কোন কথা সরে না।

তিনি বসে পড়েন।

ক্ষেপা এবার বোলতে শুরু করেন: হ্যাঁরে, গাড়ী ছাড়ার আগে বুঝি আসতে পারিসনে, ওতে যে বিপদ হোতে পারে। মা তারার কাছে আসছিস, তাই তোর গাড়ীর ইঞ্জিনটা খারাপ কোরে দিলাম। ওরে, পথে যে কত বাধা! তাড়াতাড়ি করে, বিপদ বাধালে কি কোরেই বা এসব বাধা উৎরবি, আর কি কোরেই বা মা তারার কাছে পৌঁছবি?

ভদ্রলোক কোন কথা বোলছেন না—শুধু পরম বিস্ময়ে এই সিদ্ধপুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বামাক্ষেপা বোললেন: কিরে, কি ভাবছিস—কিছুই ভাবিসনে। মা তারার পদে এমনি ধারা মতি রাখ, সব হবে। মা তারা তোর মধ্যেও আছেন। কাজ কর। তোর মাঝেও তিনি প্রকাশ হোতে পারেন।

—আমাকে আশীর্বাদ করুন।

বামাক্ষেপা আবার চুপ কোরলেন।

একেবারে চুপ যেন, কোন জ্ঞানই নেই। হঠাৎ তিনি 'জয় তারা' বোলে হাঁক ছাড়েন। ভদ্রলোক কেঁপে ওঠেন।

এমন সময় একটা টিকটিকি বাঁশের খুঁটিতে ডেকে ওঠে।

বামাক্ষেপে বোলে ওঠেন: ওর বিয়ের কনে আসছে, তাই ও অত ডাকছে।

একজন বোলে ফেললেন: কি যে বলেন তার ঠিক নেই।

—আমি পাগল তাই না? বল্ শালা, সবাই বোলছে, আর তুই-বা বাদ যাবি কেন। শোন তবে—ওর কনে আছে বর্ধমানে, আজই ওদের বিয়ে হবে।

—কোথায় বর্ধমান আর কোথায় তারাপীঠ, কি কোরে ওর বিয়ের কনে আসবে?

সন্ধ্যে তখনও হয়নি।

সূর্য ডোবে ডোবে। এমন সময় একটা পাটি বিক্রেতা মাথায় কতকগুলো পাটি নিয়ে আশ্রমের পাশে এসে দাঁড়ালো।

একজন বোললে: কোথা থেকে আসছো গো?

—বর্ধমান থেকে, ভেবেছিলাম গ্রামের মধ্যে বেচেকিনে আবার ফিরে যাবো। কিন্তু সন্ধ্যে হোয়ে গেলো। তাই ভাবলাম, এদিকে কোথাও রাত কাটিয়ে নি।

বামাক্ষেপা একটু হেসে বোললেন: তা পাটি নামাও। ওর মধ্যে যে আমার বিয়ের কনে বসে আছে!

লোকটা পাটির বোঝা নামাতেই ওর মধ্য থেকে একটা টিকটিকি বের হয়ে বাঁশের খুঁটি বেয়ে সোজা আগের টিকটিকির কাছে চলে গিয়ে মুখ ঘসাঘসি কোরতে লাগলো।

ক্ষেপা বোলে ওঠেন: দেখলি তো কনে এলো কিনা!

ক্ষেপা আপন মনেই বোলে ওঠেন: মা তোরা তোর যে কত লীলা!......

॥ তেইশ ॥

তারা মায়ের মন্দির-চত্বরে ক্ষেপা বসে আছেন। চারিদিকে ভক্তবৃন্দ। ক্ষেপা সামনে জীবিত কুণ্ডের দিকে চেয়ে আছেন। কি দেখছেন উনিই জানেন!

ক্ষেপা বোললেন: তোরা কলির জীব, তোদের অত ধর্মকর্ম কোরবার প্রয়োজন নেই—শুধু জপ কর্, তাহলেই হবে। মা তারার নাম কর্। শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই লাগবে না। মা তারার নাম নিয়ে অন্তরের রিপুগুলোকে চুন-বালি-শুরকী কোরে ফেল। রিপুগুলো যদি ওতে পরিণত হয় তাহলে মন তৈরী হোয়ে যাবে। মন তৈরীর জন্যই যত সাধন-ভজন তপ-জপ। মন তৈরী হোলে আর মাকে খোঁজবার জন্য মন্দিরে যেতে হবে না, তীর্থে যেতে হবে না। মাতো তখন তোর অন্তরে। ডাকবি আর পাবি।

ক্ষেপা একটু থেমে আবার বলেন: পরম ব্রহ্ম নিরাকার। ব্রহ্মের আত্মাই তো আদ্যাশক্তির রূপ। শক্তি নারীরূপা। মাতৃরূপেই আগে সাধনা করার দরকার। কারণ মা আগে—আমরা জন্মেই মাকে আগে দেখি, মায়ের কোলে আশ্রয় পাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে যায় চারিদিকে। মা তারার আরতির সময় হোয়ে যায়।

ক্ষেপা বোলে ওঠেন: তোরা আকুল হোয়ে মাকে ডাক্, সব দুঃখ-কষ্ট দূর হোয়ে যাবে, এ যুগে ও ছাড়া আর অন্য গতি নেই।

ক্ষেপা নিরক্ষর—কিন্তু মায়ের কৃপা বলে আজ তিনি পরমজ্ঞানী। দুনিয়ার সমস্ত অক্ষরই যেন তাঁর কণ্ঠে এসে বাসা বেঁধেছে। নিরক্ষর বামাক্ষেপা আজ সর্বজ্ঞ। তাঁর মুখের কথায় যেন সবকিছু চলছে।

ক্ষেপা আরতি কোরবার সময় যেন একেবারে ভাব-সমাধিতে

ডুবে যান! দেবীর রাঙা চরণ ভরে গিয়েছে ফুলে ফুলে। ধূপধুনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত। গলায় রক্তজবার মালা দুলছে। বরাভয়দায়িণী মা তারা আজ যেন চিন্ময়ী হোয়ে গিয়েছেন। প্রদীপের আলোয় চোখের তারা দুটো যেন জ্বল জ্বল কোরছে। মনে হোচ্ছে যেন কি বোলতে চাইছেন।

ক্ষেপা চীৎকার কোরে উঠলেন: বল্ না বেটি কি বোলতে চাস! চারিদিকে আজ তোর বুভুক্ষু সন্তানের দল তোর মুখের দিকে চেয়ে আছে। অর্ধাহারে অনাহারে তারা মৃত্যুর দিন গুণছে, আর তুই দুবেলা ভোগ খাচ্ছিস। এ তুই কোন্ ধরণের মা? আজ তোকে বোলতে হবে—এ তোর কেমন লীলা!

ক্ষেপা ভোগের থালা সরিয়ে রেখে পাগলের মত ফুল-বেলপাতা ছুঁড়তে লাগলেন মায়ের মূর্তির দিকে।

আর শুধু বোলতে থাকেন: আজ মা ছেলেতে একটা বোঝাপড়া হবে।

আশপাশে যারা ছিল তারা ভয়ে জড়সড় হোয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বোলবার উপায় নেই। রাণীভবানী হুকুম দিয়েছেন ক্ষেপার কাজে বাধা না দিতে।

ক্ষেপা মন্দিরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পরে ক্ষেপা একটু সুস্থ হোয়ে আপনমনে বোললেন: বেটি লুকিয়ে গেলো ভয়ে।

পরে মা তারার দিকে চেয়ে বোললেন: গায়ে হাত বুলিয়ে শুধু আদর কোরলে আমি ভুলছি না।

ক্ষেপা পাগলের মত টলতে টলতে শ্মশানের দিকে চলে যান। এ পৃথিবীতে কোন কিছু আজ যেন তাঁর অজানা নেই।

কথিত আছে, ঐদিন রাত্রে মা তারার মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেবী তারা সত্যি সত্যিই বামার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন আশ্রমে এসে।

ক্ষেপার তন্দ্রা ভাঙলে তাঁর চোখে পড়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলো আপন মনে চলে গিয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ কোরল।

ক্ষেপা হঠাৎ এই অন্ধকার রাতে চীৎকার কোরে ওঠেন : ওরে জাম ভোলা, শ্বেতফুলি, শাবলি দিদি—তোরা এতক্ষণ কোথায় ছিলি —শুধু তুবেলা পেসাদ খাবার বেলায় আছিস, এদিকে যে মা এসে চলে গেলো, একটু ধরে রাখতে পারিলি না!

আবার পাগলা চেঁচিয়ে ওঠেন : জয় তারা, জয় তারা! মড়ার খুলির ভিতর থেকে একটু কারণ বারি গলায় ঢেলে গেয়ে ওঠেন—

"কালো মেয়ে তো অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য কালো।
হৃদয়-মাঝে রাখলে পরে
হৃদিপদ্ম ক'রে আলো।"

সেদিন ক্ষেপা বসে আছেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে। আশপাশে মহাশ্মশানের জংগলে হিস্ হিস্ শব্দ, মনে হোচ্ছে শত সহস্র বিষধর সাপ জিভ বের কোরে লক লক কোরে ছুটে আসছে। শিমূলতলায় পাতাঝরার গান।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। দ্বারকার ওপারে তাঁতীরা খট্‌খট্ কোরে তাঁত চালাচ্ছে। তার একটা সুমধুর শব্দ ভেসে আসছে।

ক্ষেপার দৃষ্টি উদাস। ঠোঁট তুটো শুধু নড়ছে। পরে বিড়বিড় কোরে আপন মনেই বলেন : আর কতকাল এ ঘোর গোলক-ধাঁধায় ঘুরাবি? তোর পরীক্ষার কি শেষ হয়নি? আর কেন, এবার রাঙা চরণে ঠাঁই দে।

ক্ষেপা বালকের মত কাঁদতে থাকেন। তুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে। ছেলে যেমন মার কোল পাবার জন্য আকুল হোয়ে কাঁদে ক্ষেপাও তেমনিভাবে কাঁদছেন।

সহসা তিনি চমকে ওঠেন : দাঁড়িয়ে কে রে!

—আমি।

—তুমি কে হে বটে শালা, এদিকে আসতে পারছোনা ?

এক যুবক, সুঠাম দেহ, মাথায় ঘন চুল, চোখে-মুখে হাজারো প্রশ্নের ভীড়।

যুবক ক্ষেপার পায়ের ওপর পড়ে বোলে ওঠে : বলুন। আরও কত পথ চলতে হবে। এ পথের শেষ কোথায় ?

ক্ষেপা জবাব দেন : ভুল পথে চলেছিস রে! ওপথে মানুষের মুক্তি হবে না। ওরে ফিরে আয়।

—তার মানে ?

—তার মানে !……

ক্ষেপা হাসেন, যে হাসিতে বরাভয়, সে হাসিতে যেন সব প্রশ্নের জবাব মেলে।

ধীরে ধীরে যুবককে কাছে ডাকেন।

যুবক ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় ক্ষেপার দিকে।

ক্ষেপা যুবকের গায়ে হাত দিতেই তার যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। তার সমস্ত মন-প্রাণ যেন এক দিব্যজ্যোতিতে আচ্ছন্ন হোয়ে যায়। চোখের সামনে এক বরাভয় মূর্তির প্রকাশ পায়।

যুবক চীৎকার কোরে বলে : হারিয়ে গেলাম, বাঁচান।

ক্ষেপা তাকে একটা চাপড় মেরে ধরে তোলেন ও বলেন : ওরে, হারাবি কোথায় ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাজারো রকমের পথ আছে মা তারার কাছে পৌঁছাবার। যে কোন একটা পথ ধরে সোজা চলে যা, ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবি। একটু আগেই তো দেখতে পেলি, তোর পথে অন্ধকার নেই, আলো ধরেই তো তোকে মা ডাকছেন, যা এগিয়ে!

—বাবা, আমি অজ্ঞান—

—জ্ঞানের বাতি সহস্র শিখায় তোর অন্তরে জ্বলছে—

—একটু থেমে বলেন ক্ষেপা : মানুষের দুঃখে তোর মন বড় কাঁদে,

তাদের দুঃখ ঘোচানোর ব্রত নিয়েছিলি, কিন্তু বোমা ফাটানোর ছল কোরে কি তাদের দুঃখ ঘোচাতে পারবি ?

—আপনি সর্বজ্ঞ, এই পথই তো আমি বেছে নিয়েছিলাম। দেশ যে ডুবে গেলো বাবা।

—মানুষের মুক্তির একটা মাত্র পথ আছে, সে পথ মাতৃসাধনা। তোর ভিতরে যে সৎপ্রবৃত্তির মশলা আছে তাই দিয়ে ভক্তির বোমা তৈরী কর্. তারপর……।

ক্ষেপা একটু থেমে বলেন : তারপর সেই বোমা নিয়ে গিয়ে মার্ ঐ বেটির মাথায়। দেখবি মৃন্ময়ী মা আমার চিন্ময়ী হোয়ে গিয়েছেন। এ ছাড়া বাঁচবার কোন রাস্তা নেই। ওরে, দেশজননীও তো মা তারা। জাগা, জাগা, দেশ জাগবে, মানুষ জাগবে, গাছে ফুল হবে, ফল হবে।

যুবক ধীরে ধীরে প্রণাম কোরে ওঠে।

আবার আসিস্—তোকে আমার বড় ভাল লেগেছে, তোর মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মের রূপ বর্তমান, তোর মধ্যে চৈতন্যশক্তি জাগ্রত, তোর মধ্যে অখিল বিশ্ব একাকার হোয়ে আছে। তোর মধ্যে মা তারা, তুই কে রে—

যুবক কাঁপছে থর থর করে। পাগলটা বলে কি—

ক্ষেপা হঠাৎ উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : তুই আয়, তোকে আমার চাই।

যুবক মহাশ্মশান থেকে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে যায়।

এই যুবক তারানাথ।

তিনি ক্ষেপার প্রথম ও প্রধান শিষ্য।

ক্ষেপা তাকে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়ে দেন ও সাধন-ভজন কোরতে বলেন।

এই তারানাথই ভবিষ্যৎ জীবনে সিদ্ধ হোয়ে তারাক্ষেপা নামে পরিচিত হন জনসমাজে।

॥ চব্বিশ ॥

শারদীয়া পূজার আর দেরী নেই। তারাপীঠও দেবী বন্দনায় মেতে ওঠে। দিনরাত মানুষ আসার বিরাম নেই। কেউ এসে ক্ষেপার পায় পড়ছে, তার কঠিন ব্যাধি সারছে না। কেউ এসে সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা জানাচ্ছে।

তারাপীঠে এসে যেন সকলের সব সমস্যার সমাধান হোয়ে যায়।

ক্ষেপার চারপাশে মানুষ। মানুষের মেলা বসেছে এই তারাপীঠে—ক্ষেপার আশ্রমে। বিজয়াদশমীর দিন ভীড় হয় বেশী। এদিনে পরম সাধকের পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে যেন কারও ঘরে যাবার উপায় নেই।

ক্ষেপা মহানন্দে বিভোর। কখনও কারণ-বারি পান কোরছেন, কখনও হাসছেন, কখনও 'জয়তারা' বোলে কেঁদে উঠছেন। একেবারে যেন বালক।

ক্ষেপাকে একজন বোলে ওঠে: সংসারে থেকে রিপুর তাড়নায় আমরা পাগল হোয়ে গেলাম। এর হাত থেকে কি কোরে রক্ষা পাই?

—দূর হয়ে যাক্। কামিনী আর কাঞ্চন এই নিয়েই তো দুনিয়ারে! মা তারার সংসারই তো মায়াময়। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও রিপুর হাত থেকে রেহাই পান নি। মহামায়ার কামিনী মূর্তিই তো মহাদেবের বুকে। রিপুকে বিনাশ কোরতে কেউ পারে না। মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে তাকে দমন কোরে রাখতে হবে।

একজনের মুখ যেন নড়ে উঠলো: সংসারের এত অশান্তি এত জ্বালা। এর মাঝে মনকে ঠিক রাখা কি আমাদের মত মানুষের কাজ?

—কেনরে, সংসারে থেকে তোকে তো গেরুয়া ধারণ কোরতে

হোচ্ছে না। শাস্ত্রও পড়তে হোচ্ছে না। অত করার তোদের সময় কই? ছেলে কাঁদে, মেয়ে হাসে, এসব কোরতে কোরতেই তো তোদেয় দিন ফুরিয়ে যায়। এর মাঝেই যতটুকু সময় পাস্ মা তারাকে ডাক্। তাকে ডাকলেই শাস্ত্র পড়া হবে। তাহলেই দেখবি মন বশে আসবে। এ জন্মে যতটুকু পারিস রাস্তা এগিয়ে যা। তার পরের জন্মে আবার চেষ্টা কোরবি। ভক্তি থাকলে এক জন্মে না এক জন্মে ঠিক পেয়ে যাবি।

—মরে গেলে তো সবই শেষ হোয়ে গেলো।

—দূর বেটা। আত্মার কি বিনাশ আছে—একে আগুনে পুড়িয়েও কেউ শেষ কোরতে পারে না। জলে ডুবিয়েও কেউ মারতে পারে না। গীতায় ভগবান স্বয়ং বোলেছেন যে মানুষের মৃত্যুটা আর কিছুই নয়—শুধু জীর্ণ কাপড়টা ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরা। দেহের মৃত্যু এই মানুষের হাজার বার হোচ্ছে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু একবারও নেই।

একজন বোলে উঠলো: মাকে কি দেখতে পাওয়া যায়?

ক্ষেপা হাসেন: শালা, যত বোকা বেটার আমদানী হয়েছে। দেখবি কি কোরে? তোদের চোখে যে অবিশ্বাসের ছানি পড়েছে! ভক্তির চশমা পরে একবার তাকা দেখি। দেখবি মা-ময় জগৎ! কাজ কর আগে, তবে তো মাইনে পাবি!

দূরে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। আজ বিজয়া দশমী। চারদিন মর্তে থাকবার পর আজ দেবী দুর্গা কৈলাসে ফিরে যাবেন। মা বসুন্ধরা কাঁদছেন।

একজন জানতে চাইলে: আচ্ছা বাবা, মাকে বিসর্জন দেয় কেন—কোন সন্তান কি মাকে বিসর্জন দিতে পারে?

ক্ষেপা সোজা সরলভাবে জবাব দিলেন: মায়ের আবার বিসর্জন কিরে? ভক্ত সন্তানরা মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোরে তিনদিন আনন্দ উপভোগ করে। মাকে হৃদয়-সরোবরে ডুবিয়ে রাখে—এই তো

বিসর্জন। মা যে আমার বিশ্বজোড়া—তাকে কি নদী-নালায় কেউ বিসর্জন দিতে পারে?

ক্ষেপা এবার সমাধিতে ডুবে যান।

বামাচরণের জীবনে নেমে এলো শেষ অংশের পদচ্ছায়া। সব সময় সহজ সরলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র, আর মাঝে মাঝে বলেন—ওরে, সময় হোয়ে এসেছে, আর বেশী দিন নেই। এবার মায়ের কোলেই আশ্রয় নেবো!......

কয়েকজন বোল ওঠেন: বাবা, পঞ্চমকার সাধনার ফলটা একবার বলুন!

ক্ষেপা বলেন: মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা আর মৈথুন—এই নিয়েই হোচ্ছে পঞ্চমকার সাধনা। শুধু জেনে রাখ্ বিশ্বাস আর ভক্তিই হোচ্ছে এই সাধনার একমাত্র মূলধন। এই মূলধন ভাঙিয়ে সাধন ব্যবসা কোরে যা—লাভ হবে।

ক্ষেপা সমাধিস্থ হোলেন।

১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। বর্ষণের যেন বিরাম নেই—তারাপীঠ মহাশ্মশান জলে-জলময়। গাছপালা-বনঝোপ লতাপাতা সব যেন জলে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তীরে যে টেনে তুলতো সেই পরম সাধক বাংলার বীরাচারী তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপার জন্য মা তারা বুঝি চতুর্দোলা পাঠিয়েছেন।

শ্রাবণের প্রবল বর্ষণে দ্বারকানদী যেন একূল-ওকূল ছাপিয়ে যায়। পৃথিবীতে বুঝি আজই প্রলয় হবে।

ক্ষেপা ঐ প্রবল ধারার মধ্যে মা তারার মূর্তি যেন দেখছেন!

ক্ষেপা বোলে ওঠেন একসময়: হ্যাঁরে, বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছিস কেন, ভিতরে আয়। আমি তো তৈরী হোয়েই আছি। মা,

মা, তোকে আমি চিনতে পেরেছি, তুই কৃপা কোরে চেনা দিয়েছিস তাই তো তোকে বুঝেছি।

অন্যান্য ভক্তবৃন্দ নির্বাক হোয়ে বসে আছে তাঁর চারপাশে। একজন গেছে এই বৃষ্টি মাথায় কোরে রামপুরহাটে কবিরাজ বৈদ্যনাথ সেনকে ডাকতে। রাত বাড়ে। কি দুর্যোগময়ী রাত্রি? কোনখানে কিছুই চেনা যায় না—শুধু বর্ষার নৃত্য।

আমরা যারা কলির মানুষ। আমরা বুঝতে পারি সব, তবুও জ্ঞানপাপী। এই দেহ একদিন ধূলাতে মিশবে তবুও আমাদের অহং ভাবের শেষ হোল না। কামনা বাসনার চেয়ার টেবিলে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরছি। তাই তো আমাদের সুখ নেই শান্তি নেই, এত দারিদ্র, এত হাহাকার। ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিলাম জনম ভোর।

এই দুচোখে আমরা দেখছি পাহাড়-পর্বত। কিশোর যৌবন বার্ধক্যে জরা মৃত্যু ব্যাধি, শোক তাপ। এই দুচোখে দেখছি জন্ম মৃত্যুর বিভিন্নরূপ। দেখছি ঘূর্ণায়মান পৃথিবী—তবুও আমরা বোলছি ভগবান নেই। মানবদেহেই তো জীবাত্মার স্থিতি। এই জীবাত্মাই তো সবকিছু ভোগ কোরছেন দিনরাত। আবার এই জীবাত্মাই ঈশ্বরের উপাসনায় মত্ত! আমরা পণ্ডিত, কেউ বিদ্বান, কেউ প্রবল শক্তিশালী, আমরা কি না? শুধু মানুষ আমরা হোতে পারলাম না। এই দুঃখ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। কি রেখে যাবো তা জানা নেই। কাকে কি দিয়ে যাবো তাও অজানা। শুধু জেনে যাবো—একদিন জন্মেছিলাম আবার আজ মরলাম।

মহানিশা এলো চুপে চুপে। বামাক্ষেপার শ্বাসকষ্ট হয়। ক্ষেপা একসময় বোলে ওঠেন: আর কেন মা, আমি যে আর পারছিনা। ডেকেছিস যখন তখন কোলে তুলে নে।

কবিরাজ বৈদ্যনাথ সেন তখনও এসে পেঁৗছান নি।

বামাক্ষেপা হোচ্ছেন ভববৈদ্য—দেবাদিদেব শংকর! সেই মানুষরূপী ভগবানের চিকিৎসা কোরবে কে?

ক্ষেপার ঘন ঘন সমাধি হোতে থাকে। হঠাৎ একবার 'মা তারা' 'মা তারা' বোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিকষকালো কালরাত্রির নিবিড় অন্ধকারের মাঝে বাংলার এক পরম সাধকের মহাজীবনের যবনিকা পতন হোয়ে গেলো। বিন্দু সিন্ধু হোয়ে গেলো।

সকলেরই জীবননাট্যের যবনিকা আছে।

নেই শুধু বামাক্ষেপার।

মা তারা যেমন আছেন।

তেমনি আছেন সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা।

॥ পঁচিশ ॥

স্ত্রী ঘুমন্ত বাপীকে কোলে নিয়ে বসে আছে। মেয়ে আন্নু একপাশে শুয়ে আছে। সত্য, সরোজদা আর কানাইদা তিনজনই যেন গভীরভাবে মগ্ন।

স্ত্রীকে বোললাম: তারাপীঠের কথা শুনলে, তারাপীঠ তীর্থ পরিক্রমা কোরলে তবুও কি তোমার কোন ভাবান্তর হোলনা? তুমি এক ছেলের জন্য ভেবে সারা হোচ্ছ, তোমার চোখের জল শুকোচ্ছেনা, আর মা তারার কথা ভাবো দেখি, বিশ্বময় তাঁর সন্তান-সন্ততিতে ভরা—তিনি কি কোরে একইভাবে রয়েছেন!

স্ত্রীর চোখে জলের ধারা নেমে এসেছে। চোখ দুটো মুছে শুধু বোললে—কাঁদতে তো আমি চাইনে। তবুও চোখ দুটো আমার জলে ভরে আসে কেন? যে মহাপুরুষের কথা এতক্ষণ শুনলাম তাঁর মত আরও সাধক পুরুষ আমাদের দেশের মাটিতে এসেছিলেন তাই না?

—হ্যাঁ! আমাদের এই ভারতবর্ষ দেবতার দেশ, যোগী ঋষির দেশ। এইখানেই শাস্ত্র সৃষ্টি হোয়েছে, এর মাটিতে আমরা পেয়েছি নানান রকম পুঁথিপত্র, ধর্মশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সবই আমাদের দেশের। সাধক ভরা দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। এটা মানুষ তৈরীর দেশ। এইখানেই আমরা পেয়েছিলাম আচার্য শংকর, ভাস্করানন্দ স্বামী, গম্ভীরানাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাক্ষেপা, কাঠিয়াবাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, সন্তদাস বাবাজী, বিবেকানন্দ, নিগমানন্দ সরস্বতী, তারকনাথ ব্রহ্মচারী, ঠাকুর হরনাথ, ভোলানন্দ গিরি, সাধক কমলাকান্ত, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, খাকিয়াবাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, চরণদাস বাবাজী প্রভু জগদ্বন্ধু, ভক্ত রামপ্রসাদ, কবীর, ভক্ত দাদু, সাঁইবাবা, রামানুজ,

সাধু নাগমশায়, মেহরের সর্বানন্দ, ভক্ত রইদাস, ভক্ত সুরদাস, প্রাণবানন্দ, ভক্ত তুলসীদাস, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, ভক্ত তুকারাম, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, মহর্ষি রমন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, শ্রীঅরবিন্দ আরও কতজনকে! বারান্তরে এঁদের কথা তোমাকে শোনাবো।

একটু থেমে বোললাম: একটা কথা হয়তো বোলবে, যে দেশে এতসব মহাসাধকের আবির্ভাব হোয়েছিল সেই দেশের এমন চেহারা কেন?

সরোজদা বোললেন: আমি ঠিক তাই বোলতে যাচ্ছিলাম।

উত্তরে বোললাম: আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি, তাই অবিশ্বাসের রঙ্গমঞ্চে নকল অভিনয় কোরে চলেছি—তাই এ দুঃখ! দুঃখ কষ্টের তাপে পুড়ে পুড়ে যদি আমরা কোনদিন খাঁটি হোতে পারি তাহলে হয়তো আবার আমরা এমনি ধারা অনেক সাধকের সাক্ষাৎ পাবো।

এমন সময় গুরুপদ পাণ্ডা এসে বোললেন: চলুন, প্রসাদ খেয়ে নেবেন, আপনাদের তো আবার বেরুতে হবে দেড়টার মধ্যে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

সত্য হেসে বোললে: যিনি এত রাস্তা আমাদের নিরাপদে এনেছেন—তিনিই আবার পৌঁছে দেবেন!

গুরুপদ পাণ্ডা একটু হেসে বোললেন: সে কথা ঠিক—মা ঠিক নিরাপদেই আপনাদের নিয়ে যাবেন।

এবার ফেরার পালা! মনে হোচ্ছে, মা যেন তাঁর কোল থেকে আমাদের নামিয়ে দিলেন। সবারই চোখ ছলছল কোরছে।

কানাইদা দেখলাম মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হাতজোড় কোরে। তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে। সরোজদার মুখে কোন কথা নেই। সত্য আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বোললে: বৌদি দিন বাপীকে আমার কোলে। এ জনমে যা কোরতে এসেছি তাই কোরে যাই।

সবাই মা তারাকে প্রণাম কোরে বেরিয়ে এলাম।

সবার পিছনে আমি আর আমার স্ত্রী।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

স্ত্রী বার বার দেখলাম চোখ মুছছে।

বোললাম: তোমার চোখের জলে মা তারার চরণ দুটো ভিজেছে, যদি তোমার চোখে আরও জল থাকে তবে তাও মা তারার চরণেই অর্পণ কোর। তাতেই তুমি শান্তি পাবে—এ ছাড়া তোমার আর কোন পথ নেই।

টুকরো মেঘের ছড়াছড়ি আকাশে। আমরা চলেছি তারাপীঠ পেছনে রেখে।

আবার সেই দ্বারকা নদী। যেন আমাদের জীবন-বৈতরণী। ·· উদ্দাম বেগে স্রোত বয়ে যাচ্ছে মহাশ্মশানের কোল বেয়ে। যেন ক্ষেপাকে বোলে যাচ্ছে: ওরে, তুই একা জাগলে হবেনা। আর সবাইকে জাগা। রাত পোহাতে আর দেরী নেই। কান পেতে শোন্, মা তারা যে ডাকছেন।

দ্বারকা নদী। পায়ের পাতা ডোবেনা কিন্তু ডুবে গেছে সারা দেহমন কোন্ অতল তলে! সারা মন-প্রাণ ভিজিয়ে দ্বারকার পারে উঠে পথ চলতে শুরু কোরলাম।

টুকরো মেঘের ছড়াছড়ি আকাশে। মেঘ গর্জন নেই, বর্ষণ নেই।

পেছন ফিরে তাকালাম।

মা তারার মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে বনঝোপের ফাঁক দিয়ে। মনে হচ্ছে, মা যেন বোলছেন: এগিয়ে যা, আমি দেখছি।

॥ সমাপ্ত ॥